# বাংলাদেশের অভ্যুদয়

আবুল মাল আবদুল মুহিত

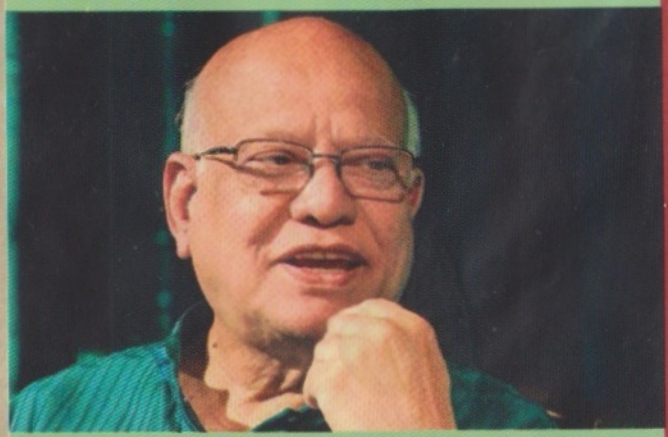

লেখক, গবেষক, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, প্রশাসক, পরিবেশবিদ ও অর্থনীতিবিদ আবুল মাল আবদুল মুহিত এই জানুয়ারিতে ৮১-তে পদার্পণ করলেন। কৈশোরে ছাত্র সংগঠন এবং ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন এবং ১৯৫৫ সালে সলিমুল্লাহ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সর্বদলীয় কর্মপরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে কিছুদিন জেলে কালাতিপাত করেন। মেধায় শীর্ষ অবস্থানে আসীন এই ছাত্রনেতা পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসেবে কর্মজীবনের সূচনা করেন।

পূর্ব-পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের প্রায় ১৩ বছর চাকুরি করে তিনি ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসে অর্থনৈতিক কাউন্সিলর হিসেবে নিযুক্তি পান ১৯৬৯ সালে। সেখান থেকে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মার্কিন কূটনৈতিক, শিক্ষামহল ও সংবাদ মাধ্যমে তিনি ছিলেন একজন সৈনিক। ২৫ বছরের সরকারি চাকুরি জীবনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বাগেরহাটে মহকুমা কর্মকর্তা, গবর্নরের উপসচিব ও সচিবালয়ে উপসচিব, পাকিস্তানের মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে উপসচিব, আমেরিকায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মিনিস্টার ও চার্জ-দ্য এ্যাফেয়ার্স, ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক, ম্যানিলায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকে নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব হিসেবে স্বেচ্ছা অবসরে যান ১৯৮১ সালে।

১৯৮২ এবং ১৯৮৩ সালে তিনি বাংলাদেশে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী ছিলেন এবং ESCAP-এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। প্রায় আড়াই দশক তিনি একজন উন্নয়ন পরামর্শক হিসেবে বিরাজ করেন। এই সময় তিনি বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলন গড়ে তোলেন প্রথমে 'পরশ'-এর সভাপতি এবং পরে 'বাপা'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালামনাই এসোসিয়েশনেরও সভাপতি ছিলেন। ২০০১ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হন। ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ২০০৯-১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী। ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে আবার নিয়েছেন অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব। তার লেখালেখির বিষয় হলো ইতিহাস, অর্থনীতি, প্রশাসন, ভ্রমণ, পরিবেশ, রাজনীতি এবং সুশাসন। ইংরেজি এবং বাংলায় প্রকাশিত তার বইয়ের সংখ্যা বিশ-এর উর্ধ্বে।

www.pathagar.com

লেখকের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে লেখা প্রায় ৫০০ কলাম থেকে বেছে তেরটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, কলামগুলো প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সাল থেকে শুরু করে ২০০৮ সাল পর্যন্ত। বেশির ভাগ রচনাই ডিসেম্বরে বিজয়ের মাস অথবা মার্চে আন্দোলনের মাসে প্রকাশিত। ২০০১ সালের শেষ লগ্ন থেকে শুরু করে ২০০৬ সালের শেষ লগ্ন পর্যন্ত চার দলীয় জোটের দুঃশাসনের আমলের লেখা হলো চারটি আর ২০০৭ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের লেখা হলো ছয়টি কলাম। এই সব রচনায় বিভিন্ন জাতীয় সংকটের বিষয়ে তুলে ধরা হয়। বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের বিকাশ সম্বন্ধে বক্তব্য বেশি এবং বলা হয় যে এই দুখণ্ডে একটি যৌগিক জাতি হাজারোর্ধ্ব বছরে প্রতিষ্ঠা পায়। এই জাতিরাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় মৌলিক ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা। আদিবাসী, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টান– বিভিন্ন জনগোষ্ঠির সংমিশ্রণ। এই প্রক্রিয়ায় এখানে সমুন্নত হয় চারটি আদর্শ– ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য, পরমত সহিষ্ণুতার মাধ্যমে সংগঠিত জাতিয়তাবাদ এবং ন্যূনতম সমতার জন্য সমাজতন্ত্র। এই সত্ত্বাগত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে চারদলীয় জোটের ধর্মীয় জঙ্গীবাদ, নির্বাচন চুরি ও জালিয়াতি, দেশের সম্পদ লুণ্ঠন ও সীমাহীন দুর্নীতি এবং ব্যাপক গণহত্যা ও নির্যাতন। স্বাভাবিকভাবেই দেশ ও জাতি এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং অপেক্ষায় থাকে একটি অবাধ নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনের জন্য।

গ্রন্থে বলা যায়নি কিন্তু আমরা জানি ২০০৮-এর নির্বাচন কী ম্যান্ডেটটি প্রদান করে। বাংলাদেশের তমসা কেটে গিয়ে আবার হয় অভ্যুদয়।



www.pathagar.com

# বাংলাদেশের অভ্যুদয়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# বাংলাদেশের অভ্যুদয়

আবুল মাল আবদুল মুহিত

সময় প্রকাশন

www.pathagar.com

বাংলাদেশের অভ্যুদয়
আবুল মাল আবদুল মুহিত
© লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৫

সময়

সময় ১০২৪

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
সময় প্রিন্টার্স
২২৬/১ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা

**মূল্য: ১৫০.০০ টাকা মাত্র**

BANGLADESHER AVUDOY by A. M. A. Muhith. First Published: February Book Fair 2015, by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka 1100.

Web: www.somoy.com E-mail: info@somoy.com

**Price: Tk. 150.00 only**

ISBN 978-984-91057-0-1 Code: 875

নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র 'সময় . . .', প্লাজা এ. আর, (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন : ৯১১৬৮৮৫

অন লাইনে পাওয়া যাবে: www.rokomari.com, www.boi-mela.com

www.pathagar.com

## উৎসর্গ

যে মহামানবের প্রচেষ্টায় স্বাধীন সার্বভৌম
বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয় তার নামে
বইটি উৎসর্গ করা হল
**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**-কে

www.pathagar.com

## সূচিপত্র


স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীতে আহাজারি : জাতীয় আত্মহত্যা?
২৪ মার্চ ১৯৯৬, ভোরের কাগজ ৯ - ১৬
বিজয়ের মাসে ক্ষোভ ও হতাশা
১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯, ভোরের কাগজ ১৭ - ১৯
বিজয় মাসের বাণী ও প্রত্যাশা
বিজয় দিবস সংখ্যা ২০০২, সংবাদ ২০ - ২৫
বিজয় দিবসের প্রত্যয়
বিজয় দিবস সংখ্যা ২০০৩, সংবাদ ২৬ - ৩১
২০০৬ সালের মার্চ
স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ২০০৬, জনকণ্ঠ ৩২ - ৩৭
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা
১৫ আগস্ট ২০০৬, যুগান্তর ৩৮ - ৪৫
অন্ধকারে দুষ্ট চক্র পরাজিত হবেই
৫ ডিসেম্বর ২০০৬, যুগান্তর ৪৬ - ৪৮
একুশের শিক্ষা ও বর্তমান বাস্তবতা
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, যুগান্তর ৪৯ - ৫৪
মার্চের অসহযোগ আন্দোলন
১ মার্চ ২০০৭, যুগান্তর ৫৫ - ৫৯
মার্চ মাসে যেমন ভাবছি
২৮ মার্চ ২০০৭, জনকণ্ঠ ৬০ - ৬৬
বিজয়ের মাসের ভাবনা
৪ ডিসেম্বর ২০০৭, যুগান্তর ৬৭ - ৭০
বিজয়ের মাস ও সামনের চ্যালেঞ্জ
১৯ ডিসেম্বর ২০০৭, ভোরের কাগজ ৭১ - ৭৬
একুশে স্বাধীনতার প্রথম সোপান
৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, যুগান্তর ৭৭ - ৮০


www.pathagar.com

# স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীতে আহাজারি : জাতীয় আত্মহত্যা?

স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীতে জাতি যে বিপর্যয়ের মুখে তাতে এ উপলক্ষে ভাবনাকে গুছিয়ে বলা কষ্টসাধ্য। শুধু ক্ষোভ এবং ক্রোধই সুস্থির ভাবনাকে ব্যাহত যে করে তা নয়, একই সঙ্গে রয়েছে ব্যর্থতার গ্লানি। একটি সহজ উপায়ে এই বিপদ থেকে রেহাই পাওয়া যায় আর তা হলো অতীতের রোমন্থন। এই বিকল্পের আশ্রয় আমি নিয়েছি এবং এই সারাটি বছর ধরে আরো নেবো। কিন্তু আজকে বিবেচনা করতে চাই আমাদের ব্যর্থতা যা থেকেই ক্ষোভ এবং ক্রোধের উদ্ভব। আমাদের ব্যর্থতা এবং আমাদের প্রজন্মের অপরিণামদর্শিতা ভবিষ্যতকে করেছে খুবই কণ্টকাকীর্ণ। এ জন্য ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

আজ এই ব্যর্থতার বয়ানই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। যদি এর বিহিত নতুন প্রজন্ম করতে পারে, যদি এ সম্বন্ধে তারা সাবধান হতে পারে। আমরা কি চেয়েছিলাম তার সঙ্গে আমরা কি করলাম আর কি পেলাম এর হিসাব কোনোমতেই মেলানো যায় না।

এই মার্চ মাসের পঁচিশ দিন আমরা অসহযোগ আন্দোলন করে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে রোমন্থনও সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। আমরা আমাদের বহুদিনব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন যার একটি প্রধান অধ্যায় হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং শেষ অধ্যায় হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ, তাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে। তাই ছাব্বিশ মার্চের পূর্ববর্তী সব বীরত্বগাথাই বাদ দেওয়া হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের বীরত্বগাথা শুনতে হয় বিবিসির বাংলা সার্ভিসে। প্রতিবিপ্লব যেভাবে আমাদের গর্বকে আমাদের মধ্য থেকে বিদায় দিয়েছে, সে লজ্জার কাহিনী হলো আমাদের ব্যর্থতা। অন্ততপক্ষে ব্রিটিশ আমল থেকে বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের যে ধারা ও আন্দোলনের সূচনা হয় তারই সার্থক ফসল আমাদের বাংলাদেশ।



www.pathagar.com

ঐতিহ্যের এই সন্ধান নিতে ও দিতে আমরা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছি। এই ব্যর্থতার গ্লানি মেটাতে হবে প্রদীপের আলোয় এবং মুক্তচিন্তায়।

পঁচিশ বছরে আমাদের সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা হলো যে আমরা মুক্তিযুদ্ধেরও ইতিহাস ভুলে বসে আছি। এটা অবশ্যি বিস্মৃতি নয়, বিকৃতি। কতোগুলো খুনির কাঁধে ভর করে যে মুহূর্তে পরাজিত শক্তি ক্ষমতা কুক্ষিগত করলো তখন থেকেই শুরু হয় ইতিহাস বিকৃতির সুচিন্তিত পালা। প্রথমেই বঙ্গবাৎসল্যের নামে আমরা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বর্বরতা ও রক্তলোলুপতাকে ভুলে যেতে চাইলাম। এদেশে হানাদার বাহিনী ও অবৈধ দখলদার জান্তা মঙ্গলগ্রহ থেকে আসে নি, তারা এসেছিল পাকিস্তান থেকে। মাত্র এই সেদিন এই বর্বরতার জন্য ক্ষমা চেয়েছে পাকিস্তানের একটি মহিলা সমিতি, প্রথম ক্ষীণ আওয়াজ এই শোনা গেল। কিন্তু আমরা সরকারিভাবে আমাদের হানাদারদের নাম নিতে পারি না, তাদের অত্যাচারের কাহিনী স্মরণ করতে পারি না। শান্তি ও শৃঙ্খলার খাতিরে এবং সমঝোতার আকাংখায় প্রতিবিপ্লবকে সহ্য করা, সূচনায় তাকে প্রতিহত না করা এবং অংকুরে তার বিনাশ সাধন না করা হয়েছে আমাদের ব্যর্থতা।

যে যুগান্তকারী মহামানব ও নির্দিষ্ট জননেতা পর্যায়ে পর্যায়ে স্বাধীনতার সূত্রপাত করলেন। করলেন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যার উদাত্ত আহ্বানে শুরু হলো স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায়-বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ– সেই ব্যক্তি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম এদেশে নিতে মানা। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস যে চিন্তাবিদ রাষ্ট্রনেতা এবং আজন্ম দেশসেবক তাজুদ্দিন আহমদ শক্ত হাতে এই তরীর হাল ধরে থাকলেন তাঁকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বিস্মৃতির অতলে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যে নিরহংকার দেশপ্রেমিক সৈয়দ নজরুল ইসলাম নেতৃত্বের শূন্যতা কৃতিত্বের সঙ্গে পূরণ করলেন তাঁর পরিচিতি বিতাড়নের উদ্যোগ চলছে এই দেশে। যে আওয়াজে আসলো স্বাধীনতা আর যে রননিনাদ ছিল মুক্তিযুদ্ধের হুংকার সেই 'জয় বাংলা' হলো এদেশ থেকে নির্বাসিত। এ সত্যি ভানুমতির খেল বটে! আমরাই লাই দিয়ে পালন করছি মুক্তিযুদ্ধের শত্রুদের, আমাদের স্বাধীনতার বিরোধীদের। নির্বিবাদে এই অপশক্তি, মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি, দুই যুগ ধরে দেশটাকে দখল করে রয়েছে। আমরা তাদের সমাজে আসন করে দিয়েছি, আমাদের মাঝে গ্রহণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতাও করছি। এইই আমাদের ব্যর্থতা, এইই আমাদের লজ্জা। সাহিত্য ও ইতিহাস সাধনায় এবং সর্বোপরি পাঠ্যবই রচনায় আমাদের ব্যর্থতা। আমরা



www.pathagar.com

সেমিনার– বিশারদ ও সভাসমিতি প্রিয় জাতি হিসেবে আমাদের নাম রেখে যেতে ব্রতী, কিন্তু যথাস্থানে ইতিহাসের পাওনা আদায় করতে বড়ো কৃপণ।

কদিন আগে আমাদের জাতীয় গ্লানি মোছাবার একটি সাহসী উদ্যোগ সর্বসাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তার জন্য নয়জন উদ্যোক্তাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। আকু চৌধুরী, সারওয়ার আলী, রবিউল হোসাইন, মফিদুল ইসলাম, আসাদুজ্জামান নূর, জিয়াউদ্দিন, তারিক আলী এবং আলী ও সারা যাকের প্রায় দেড় বছরের চেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্বোধন করেছেন। ঢাকা জাদুঘরে স্বাধীনতার ঊষালগ্নে একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু সরকারি প্রতিবন্ধকতার ফলে তা বেশিদূর এগোয় নি। এবারের উদ্যোগটি নিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা নিজে, আমাদের সার্বিক ব্যর্থতাকে মোচন করবার এই প্রয়াস ইতিহাস বিকৃতি রোধের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। একই সঙ্গে স্মরণ করি ছ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট প্রতিষ্ঠান– মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র।

স্বাধীনতা কেন? দেশের মানুষের ক্ষমতায়ন, তাদের সৃজনশীলতার বিকাশ আর তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা। এই তিনটি উদ্দেশ্যেই স্বাধীনতা নিহিত। বাঙালির ক্ষমতায়নের জন্য আমরা শেষ পর্যন্ত অস্ত্র হাতে নিই। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচনে ম্যাণ্ডেট নিয়ে স্বশাসনের জন্য দাবি তুললেন আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ। কিন্তু ক্ষমতাধর জান্তা এই ম্যান্ডেট স্বীকার করলো না, পরিবর্তে নির্যাতন শুরু করলো এবং সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দিলো। বাংলার মানুষ তখন প্রতিষ্ঠিত সরকারের (তখন জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুক্তিযুদ্ধে মেতে গেল। আজ কোথায় সেই মানুষের ক্ষমতায়ন? স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা অনবরতই স্বেচ্ছাচারের শিকার। গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু অস্ত্রধারী খুনি ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট একটি বীভৎস হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করলো সামরিক শাসন। চেহারা পরিবর্তন করে, প্রত্যক্ষভাবে এবং ছদ্মবেশে, এই শাসন আমাদের উপর চেপে রইলো সুদীর্ঘ ১৬ বছর, ১৯৯০ সালের ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য, গৃহযুদ্ধ পরিহারের নামে আমরা এই বর্বর রাজত্বকে শুধু সহ্য করলাম না বরং নানাভাবে সহায়তা করলাম। তার বৈধতা প্রদান করলাম, তার দোসর হলাম। এক হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটাই ছিল সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অথচ স্বাধীনতার তিন বছরের মাথায় আমাদের ঘাড়ে চেপে বসলো সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথর।

কিন্তু এর চেয়েও দুঃখের বিষয় হলো নির্বাচিত প্রতিনিধির স্বেচ্ছাচার।



www.pathagar.com

যথাযথভাবে নির্বাচিত জননেতা/ জননেত্রী যেখানে স্বেচ্ছাচারিতার অনুশীলন করেন, সেখানে মানুষের সুখ-দুঃখ বা চিন্তা-ভাবনার বিবেচনা মোটেই থাকে না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছর দুয়েকের মধ্যেই শুরু হলো এই অভিজ্ঞতা আর এবারে হচ্ছে তারই নিকৃষ্ট পুনরাবৃত্তি। এই দুর্ভাগা দেশে ক্ষমতা পরিবর্তন কখনো শান্তিপূর্ণভাবে বা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় হয় নি। সামরিক অভিযাত্রা এই প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করে তিন তিনবার– ১৯৭৫-এ, ১৯৮১-তে এবং ১৯৮২-তে। ১৯৭৫-এ আবার দুবার এই অঘটন ঘটে। ১৯৯৬ সালে এই প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করলো ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপির) লাগামহীন ক্ষমতালিপ্সা এবং সীমাহীন দুর্নীতি। আগামী পঁচিশ বছরের জন্য ক্ষমতার ইজারা চায় বিএনপি। বিএনপির দলীয় স্বার্থ হয়ে গেছে রাষ্ট্রস্বার্থ ও জনস্বার্থ। এর জন্য ভোট চুরি ডাকাতির যে কোনো ঘৃণ্য রেকর্ডকে আমরা ম্লান করে দিয়েছি গত ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে। আমাদের নির্বাচন কমিশন পুরোনো কায়দায়ই প্রমাণ করেছে তাদের লজ্জাকর বংশবদ চরিত্র। অথচ সেই পুরোনো সুরে আবার আপিল হচ্ছে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এই জাতীয় অপমানকে মেনে নিতে। ১৯৮৮ সালের অবৈধ পার্লামেন্টের মতো এই পার্লামেন্টও নাকি আমাদের সাংবাধিনিক সংশোধনী উপহার দেবে। সংবিধানের আর কতো বলাৎকার আমাদের সহ্য করতে হবে। এই সবকিছুর পেছনে রয়েছে আমাদের ব্যর্থতা– সাহসের অভাব, অহেতুক আপোসকামিতা, নীতি বিসর্জন এবং সাময়িক বা তাৎক্ষণিক সুবিধালাভ। দেশপ্রেমকে সর্বোপরি সমাসীন করতে এবং আদর্শকে সমুন্নত রাখতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। চ্যালেঞ্জ এখন নতুন প্রজন্মের সামনে।

মানুষের ক্ষমতায়ন করতে গিয়ে আমরা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছি। পুলিশের অত্যাচার বেড়েছে, ন্যায়বিচার পাওয়া মুশকিল, মস্তানদের হাতে জিম্মি নিরীহ নাগরিক, গণবিচ্ছিন্ন সুদূরের সরকারের কর্মকাণ্ডে নেই কোনো স্বচ্ছতা বা দায়বদ্ধতা। সমাজের সর্বস্তরে বিশেষ করে রাজনীতির পরিধিতে এবং শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার অশুভ অনুপ্রবেশ চলছে নির্বিবাদে। মানুষের ক্ষমতায়ন হওয়ার পরিবর্তে তাদের অধিকার বিঘ্নিত হচ্ছে নানাভাবে। একাধিক কালাকানুনের চাপে কারাবাসের খড়্গহস্ত সব সময়ই মাথার উপর উঁচিয়ে থাকে।

এ থেকে পরিত্রানের উপায় অজানা নয় কিন্তু আমরা যথাযথ পদক্ষেপ নিতে অনিচ্ছুক অথবা ভীতু। অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্দলীয়



www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। শক্তিশালী স্বাধীন নির্বাচনী কমিশন স্থাপনের নজীরের অভাব নেই। স্বেচ্ছাচারী বা গণবিচ্ছিন্ন প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করার ক্ষমতা অজানা নয়। শক্তিশালী স্বয়ম্ভর স্থানীয় শাসনের রূপরেখা বহুল আলোচিত। কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীকে বিলুপ্ত করে জনহিতে নিবেদিত স্থানীয় পুলিশ নিয়োগের রীতি বহু দেশে প্রচলিত। অসংখ্য গোয়েন্দা সংস্থার বিলুপ্তি সাধন করে ফৌজদারী ও নিরাপত্তা বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধিদের কাছে দায়বদ্ধ গোয়েন্দা সংস্থার সফলায়ন অবিদিত নয়। ব্যর্থতার পরিবর্তে বিড়ালে ঘণ্টা পরাবার সাহস সঞ্চয় করবে কে?

মানুষের সৃজনশীলতর বিকাশ করে তার অর্থনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তনের অঙ্গীকার ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম ভিত্তি। কিন্তু সে সুযোগ করে দিতে আমরা একেবারে ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের প্রথম ব্যর্থতা অশিক্ষার অভিশাপ মোচনে অপারগতা। আমরা এই বিষয়ে মোটেই সচেতন ছিলাম না। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন আমরা পাস করি মাত্র ১৯৯০ সালে। বারো কোটি মানুষের দেশকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য যে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন তার ধারেকাছেও আমরা নই। ঢাকায় বসে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে এক কোটি চল্লিশ লাখ শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবই সরবরাহ করা একটি দুরূহ ব্যাপার। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিদ্যালয় চালানো নিতান্তই বাতুলতা। দুই লাখ শিক্ষককে নিযুক্তি, বদলি ও পদোন্নতি দেওয়া ও তাদের কাজের তদারকি করা একটি কেন্দ্রীয় পরিদপ্তরের জন্য একেবারে অসম্ভব। তাই আমাদের ছাত্রভর্তির হার দুই-তৃতীয়াংশের মতো, ঝরে-পড়ার হার তিন-চতুর্থাংশ, শিক্ষক উপস্থিতির হার অর্ধেক বা তারও কম। এই দায়িত্ব স্থানীয় সরকারে না দিয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ফল পাওয়া যাবে না। জনশিক্ষার ব্যবস্থা নিতান্ত দুর্বল। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে দুষ্ট। আধুনিক শিক্ষার প্রসারের পরিবর্তে প্রসার হচ্ছে পুরনো আমলের মাদ্রাসা মক্তব শিক্ষা। প্রগতির পরিবর্তে পশ্চাদ্ধাবন চলছে জোরেশোরে। অনুসন্ধিৎসার পরিবর্তে অন্ধবিশ্বাস এগিয়ে চলছে। মুক্তবুদ্ধির পরিবর্তে কুসংস্কার প্রাধান্য পাচ্ছে। এখানেও রয়েছে প্রতিবিপ্লবী গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের অশুভ ফসল। আধুনিক শিক্ষা শুধু সৃজনশীলতার উপাদান নয়, তা ক্ষমতায়নেরও একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু শিক্ষাকে জাগাতে হবে অনুসন্ধিৎসা, শিক্ষা এনে দেবে প্রগতি। কুশিক্ষার প্রভাব থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে এবং দশ থেকে পনেরো বছরে সারা দেশকে শিক্ষার আলো



www.pathagar.com

দিতে হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা অন্যত্র অর্জিত হয়েছে– ইন্দোনেশিয়ায়, চীনে, দক্ষিণ কোরিয়ায়, ভিয়েতনামে। এর জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় কৌশল পরিবর্তন এবং ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস। সর্বোপরি দরকার অঙ্গীকারের– যেখানে আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশে শিক্ষার পরেই প্রয়োজন মূলধন। মূলধন যুক্ত হলে হয় উৎপাদনের প্রসার। মূলধন আমাদের সীমিত, আমরা এর অনেকটা বিদেশ থেকে আহরণ করি। কিন্তু আমরা ব্যর্থ হয়েছি এই মূলধনকে গরিবের দরজায় পৌঁছে দিতে। শিক্ষা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে আমরা তার মূলধনের চাহিদাকেই দানা বাঁধতে দিই নি। তারপর সরকারি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ রীতিও উৎপাদনের পরিপন্থী হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের মন্ত্র হচ্ছে (এক) গরিবের ঋণ পাবার অধিকার এবং (দুই) পথের বাধার অপসারণ। পথের বাধা অপসারণের একমাত্র উপায় সরকার-সংকোচন, কারণ যত বেশি আমলা তত বেশি নিয়ন্ত্রণ। ঋণ পাবার অধিকার নিশ্চিত করার উপায় হলো তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের সংগঠন। এতে বিশেষ অবদান রাখতে পারে শিক্ষার প্রসার।

আরো দুটি ব্যর্থতার কথা না বললে রজতজয়ন্তীর ভাবনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। আমরা বড়ো লজ্জাহীন অকৃতজ্ঞ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রায় নয় মাস এক কোটি নাগরিক ভারতে আশ্রয় নেয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রায় চার হাজার ভারতীয় সৈন্য শহীদ হয়। পঙ্গু গাজীর সংখ্যা কতো আমার জানা নেই। আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকারে বড়ো কৃপণ।

আমরা সত্যের জন্য লড়াই করি। অথচ মিথ্যার বেসাতি আমাদের সরকারি প্রচার মাধ্যমেও প্রধান নয়, একমাত্র ব্যবসা। আমরা দেশের খবর শুনি বিবিসি, ভোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে। সরকারি প্রেসনোট আর কাগজগুলোতে সততার কোনো জায়গা নেই। আমরা জানি এসব প্রচার মাধ্যম সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখা অনুচিত কিন্তু কোনো পদক্ষেপ আমরা নিই না। তদুপরি যখন তখন সরকারি দলের লোকেরা বিদেশী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধুয়া তুলে জনগণের দেশপ্রেমের অসহনীয় অবমাননা করেই যাচ্ছে অথচ আমরা জানি তাদের বক্তব্য শুধুমাত্র অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসীন থাকার জন্য। এই মিথ্যাচার ও মিথ্যাভষণের কালচারটি হলো আমাদের ব্যর্থতা।

জাতি হিসেবে এই সার্বিক ব্যর্থতার ফসল হচ্ছে রজতজয়ন্তীর বছরে দুর্যোগ। প্রায় দুবছর ধরে যে রাজনৈতিক বিবাদ ও অচলাবস্থা চলছিল তা



www.pathagar.com

এখন চরমে পৌঁছেছে। স্বেচ্ছাচারিতা যে কোনো সামরিক শাসনামলের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। দুর্নীতি গগনচুম্বি। আইনশৃঙ্খলার রেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই। সারা দেশ এক হিসেবে বন্ধ ও মৃত। নির্বাচনী প্রহসন সঙ্কটকে করেছে প্রকট, দুর্নীতিকে দিয়েছে প্রশ্রয়, নৈতিকতাকে দিয়েছে বিসর্জন আর সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতাকে দিয়েছে বনবাস। সরকারি দল ও সরকারের, বিশেষ করে সরকার প্রধানের, বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে হয়েছে দারুণ সমস্যা আর এতেই শাসন ব্যবস্থা ভেঙে গেছে। বল প্রয়োগে যে তা উদ্ধার করা যাবে তার নজীর তো নেইই এবং আলামতও অনুকূল নয়। গণরোষের চাপে পড়ে সরকার যাতে রাজি হয় সেটা যে তারা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করবে তার কোনো বিশ্বাস নেই; তাই আন্দোলনও থামছে না। দীর্ঘদিনব্যাপী হরতাল-অসহযোগের ফলে দেশে আইনশৃঙ্খলা মোটেই নেই যদিও নিগ্রহ বলের প্রয়োগ বেড়েই চলছে। মাস্তানরা এখন কারো হুকুম মানে না– তারাই আইন, তারাই বিবদমান দুই গোষ্ঠীর ক্ষমতাধর স্তম্ভ। দেশব্যাপী জনগণের অথবা ব্যক্তিগত সম্পদের ধ্বংসলীলা চলছে অবারিত ধারায়। অর্থনীতি সম্পূর্ণ বন্ধ এবং অচল, বিএনপির প্রহসনের নির্বাচন ঘোষণা এবং নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতার আস্ফালন শুরুর পর জাতীয় উৎপাদনে লোকসান হবে প্রায় বারো হাজার কোটি টাকা (বার্ষিক উৎপাদনের প্রায় বারো শতাংশ) সম্ভাব্য খাদ্য ঘাটতির হিসাব দেওয়া মুশকিল, তবে পঁয়ত্রিশ লাখ টন যদি পঁচাত্তর লাখ টনে পৌঁছে তাতে আশ্চর্য হবো না। এটি হবে আমাদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ঘাটতি, প্রয়োজনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। রপ্তানি ব্যবসায় বঞ্চনার হিসাব কোনো মতেই তিন হাজার কোটির নিচে হবে না, তার মধ্যে কতোটা পুনরুদ্ধার করা যাবে এই মুহূর্তে তার কোনো অনুমানই অসম্ভব। কাজের অভাব ও রোজগারের অভাব এখন গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ছে। একজন ব্যবসায়ী বলেছেন, এই মহূর্তে সব ঠিক হয়ে গেলে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধারে লাগাবে তিন বছর। জাতি একেবারেই দ্বিধাবিভক্ত। নির্বাচন বাতিল করো, খালেদা জিয়া বিদায় হও এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা দিয়ে তিন মাসে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান করো-একদিকে বজ্রনিনাদ। অন্যদিকে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ষষ্ঠ পার্লামেন্টে সংবিধান সংশোধন করো তবে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন এবং অবাধ নির্বাচন। দু'বছর চিন্তা করে খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচনে রাজি হয়েছেন, পরোক্ষভাবে প্রহসনের নির্বাচন ও ষষ্ঠ সংসদের গ্রহণযোগ্যতা মেনে দিয়েছেন। তবে সন্দেহের বীজ অপসারণ



www.pathagar.com

করতে পারেন নি, অন্তর্নিহিত আস্থাহীনতা চলে যায় নি। তদুপরি সাংবাধিনিক সংশোধনের জন্য গণভোটের উদ্যোগ এই পরিস্থিতিতে গৃহযুদ্ধের আর কি বাকি রাখবে।

বিবদমান দলগুলোর অবস্থা সব সময়ই অনড়। আগে ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে। এখন হয়েছে নির্বাচন ও তথাকথিত ষষ্ঠ সংসদের বৈধতা নিয়ে। অবশেষে মার্চে একটি সংলাপের প্রাথমিক পর্ব শুরু হলো; কিছু বাস্তব সংলাপে সামনাসামনি আলোচনায় বসবার আগেই তা ভেঙে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি তো তাঁর উপদেশ ছাড়া কিছুই (প্রায় কিছুই) করতে পারেন না। রজতজয়ন্তীর বছরে এই যে দূরবস্থা তাকে এক বোদ্ধা বললেন মহা ট্র্যাজেডি। আমার মনে হয় এই অবস্থা হচ্ছে জাতীয় আত্মহত্যা এবং এর থেকে নিষ্কৃতির রাস্তা আর মাথায় আসে না।

সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের আশ্রয় নেবার কথা বহুল আলোচিত। আমিও এক সময় এ বিষয়ে প্রস্তাব রেখেছি, আইনের প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টে উত্থাপন করতে পারেন রাষ্ট্রপতি (অবশ্যি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে)। তাতে জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় স্থান পাবে। যে বিষয়ে রাজনৈতিক অবস্থান দেশকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে, রাষ্ট্রকে শাসনের অনুপযুক্ত করে তুলছে, জানমালের এবং রোজগারের নিশ্চয়তাকে বিপন্ন করছে, তাতে একটি মুক্তির পথ নির্দেশনা কোনো মতোই এড়িয়ে যাওয়া চলে না। এখন একটিই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা আক্রান্ত হয় নি বা কলঙ্কিত নয়। সবাই মিলে সারাটি বিষয় নিয়ে কি কোনো রেফারেন্সে আমরা রাজি হতে পারি না? সব প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করে একটি ব্যাপক কার্যক্রম বর্ণনা করে কি একটি রেফারেন্স প্রণয়নে করা যায় না? মানসম্মানের বিষয়, নির্বাচনী অভিযানের কৌশল, অহেতুক জেদ এবং দোদুল্যমান অভিমত– এগুলোকে কোনো উপায়ে জাতির স্বার্থের খাতিরে অতিক্রম করা যায় না?

*২৪ মার্চ ১৯৯৬, ভোরের কাগজ*



www.pathagar.com

# বিজয়ের মাসে ক্ষোভ ও হতাশা

ডিসেম্বর আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। ১৯৭১-এ এই মাসের ১৬ তারিখ মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র অধ্যায়ের হয় পরিসমাপ্তি। দখলদার পাকিস্তান দস্যুবাহিনী এ দিন বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আবার ১৯ বছর পর ১৯৯০ সালের ৬ তারিখ অপহৃত গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার হয়। দখলদার সামরিক স্বৈরাচার এ দিন তিনজোটের কাছে নতি স্বীকার করে পালিয়ে বাঁচে। এ মাসেই আমরা নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার গঠনে দীক্ষা লাভ করি। আবার এই মাসে ৫১ বছর আগে ১০ তারিখ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ গৃহীত হয়। এই মানবাধিকার সনদ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ছিল পাথেয় এবং আমাদের সংবিধানে হয় অন্যতম উপাদান। এ মাসেই মানবজাতির কল্যাণের স্বার্থে আবির্ভূত হন যীশুখৃষ্ট ইসা। যেকোনো অর্জনে ত্যাগের প্রয়োজন হয় এবং আমরাও ত্যাগ স্বীকার করেছি। পাকিস্তানি দস্যুবাহিনী আর তাদের নৃশংস দোসর আল বদর আল শামস পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে এক নজিরবিহীন হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাদের লক্ষ্য ছিল দেশকে পঙ্গু করে দেওয়া। পেশা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে যারা ছিলেন বরেণ্য তাদের নৃশংসভাবে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে মূলত বাঙালি মৌলবাদী শয়তানের দল। তবে সার্বিক বিবেচনায় ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস– উৎসব ও অঙ্গীকারের সময়। এই মাসে লেখালেখি, বক্তৃতা-বিবৃতি, স্মৃতিচারণ, সভা-সমিতি, দোয়া-দরুদ, প্রদর্শনী, উৎসব, আনন্দ-উল্লাসের ধুম স্বাভাবিক। এবার কেন জানি ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব সাড়া দিতে পারছি না। এই লেখাটিও সম্ভব হবে বলে ভাবি নি। অথচ শতাব্দী বা সহস্রাব্দীর শেষে অথবা শুরুতে অধিকতর উৎসাহ পাওয়ার কথা, ভাবতে, শুরু করি যে কেন এই মানসিক বৈকল্য। বয়স অবশ্যই বাড়ছে কিন্তু তার ভারে তো এখনো ন্যুব্জ হয়ে পড়ি নি। বছরব্যাপী অনেক বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং পূজনীয় ব্যক্তিকে হারিয়েছি, কিন্তু সেটা তো স্বাভাবিক কালস্রোতে ভেসে গেছে। আবশ্যি নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে শোকের মর্সিয়া। সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক রাজ্জাক, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই,



www.pathagar.com

দেওয়ান আজরফ উপর্যুপরি তিরোধান করলেন। এতে নিশ্চয়ই অভিভূত হওয়ার কথা। কিন্তু ভেবে দেখলাম যে দুটি বিষয়ে হতাশা আমাকে বেশ কাহিল করেছে। কেন জানি দুর্যোগের শেষে আলোর সন্ধান পাচ্ছি না। আমি সচরাচর দারুণ আশাবাদী, আশাবাদ আমার জীবনীশক্তি। আমি বিশ্বাস করি যে, নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকেই প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ আমাদের রাজনৈতিক দৈন্য, অর্থনৈতিক ব্যর্থতা এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব করবে। রাজনৈতিক কাঠামো এবং আচরণে পরিবর্তন না হলে তা নিতান্তই অবান্তরের পর্যায়ে পর্যবসিত হবে। একদিকে বিশ্বায়ন আর অন্যদিকে জাগ্রত জনতা প্রশাসনের হুমকি শক্তিকে অপ্রাসঙ্গিক করে ফেলবে। তাই আমি মনে করি যে, প্রযুক্তির চাপে এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলে মান্ধাতার আমলের সরকার সরাসরি অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষমতা এবং হুমকির জোর হবে অবান্তর। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, জনগণের পয়সায় যে জীবন ধারণ করে তারা কি অবলীলাক্রমে জনগণকে পিষে মারে, তাদের সঙ্গে মিথ্যাচার করে তাদের হুমকি, ধমকি দেয় এবং তাদের স্বার্থের পরিপন্থী অবস্থান নেয়। এরকম অশোধনীয় আশাবাদ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে বৈপ্লবিক বিবর্তনে বিশ্বাসী মানুষও কিন্তু মুষড়ে পড়েছে।

দুটি বিষয় হলো রাজনৈতিক বিভিন্নতা যা বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে এবং সন্ত্রাসের জয়জয়কার যাতে আইনশৃঙ্খলা বিদায় নিয়েছে। রাজনৈতিক ভিন্নমত জাতীয় প্রগতির জন্য অপরিহার্য। যেকোনো ব্যাপারে অগ্রগতির জন্য তার ভলোমন্দ বিবেচনা করা দরকার, বিকল্পের সন্ধান প্রয়োজনীয়। এ জন্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় বিতর্ক আমাদের কাম্য। কিন্তু বিভিন্নতা বা ভিন্ন মত যখন ধর্মবিশেষ তখন তা আর রাজনীতির অঙ্গনে থাকে না। রাজনীতিকে বলে সমঝোতা সৃষ্টির চারুশিল্প। কিন্তু যখন ভিন্ন মত হয় বিদ্বেষে পর্যবসিত, তখন তা আর রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। রাজনীতির উদ্দেশ্য হলো বিদ্বেষের অবসান এবং সহিষ্ণুতার বিকাশ। অন্যের জন্য বিবেচনা রাজনৈতিক আচরণের মূলমন্ত্র। বাংলাদেশে এই আচরণ যেন বিতাড়িত। কথাবার্তায় মেরুকরণ, বক্তৃতা-বিতর্কে অশালীনতা এবং যেকোনো সুযোগে সহিংসতার আশ্রয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে বিষিয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর 'প্রথম আলো'তে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে যেমন সমঝোতার কোনো আলামত পাওয়া যায় না, তেমনি চার দলের যৌথ ঘোষণার চার পঞ্চমাংশ জুড়ে হলো নিন্দাবাদ এবং এক পঞ্চমাংশে মোটা দাগে বর্ণিত কার্যক্রম যাকে ইচ্ছা ফর্দও বলা যেতে পারে। এই বিদ্বেষ



www.pathagar.com

ও সহিংসতার কি কোনো শেষ নেই? দেশের জন্য ভাবনা, দেশপ্রেম ও জনগণের কল্যাণ কোন সুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে? রাজনীতিতে ক্ষমতার আসনে বসা অবশ্যই একটি যথার্থ লক্ষ্য। কিন্তু ক্ষমতা কিসের জন্য? জাতির প্রগতির জন্য– মানুষের কল্যাণের জন্য। চুরিচামারি স্বজনপ্রীতিকেও মেনে নেওয়া চলে বৃহত্তর জনকল্যাণের খাতিরে। কিন্তু আমাদের বিষয়টি হয়ে গেছে নিছক ক্ষমতার লড়াই। ক্ষমতার শান শওকত চাই, ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধা চাই, দেশসেবা জনকল্যাণ চুলোয় যাক।

গত নির্বাচনে (১৯৯৬ সালে) সকল দলের সর্বাধিকারপ্রাপ্ত অঙ্গীকার ছিল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মস্তানি উচ্ছেদ। ক্ষমতাসীন দল ২১ বছর ক্ষমতার বাইরে ছিল বলে মস্তানি দমনের প্রত্যাশা ছিল খুব বেশি। কারণ মস্তান কোনো দল মানে না। তারা চায় ক্ষমতাশালীর পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাদের বিকাশ হয় ক্ষমতার আশ্রয়ে থেকে। কিন্তু পরিবর্তে আমরা দেখছি মস্তানির উত্তরোত্তর প্রভাব বিকাশ। বিনাবাধায় কোনো নির্মাণ কাজে হাত দেওয়া যায় না, কোনো ভিড়ে প্রবেশ করা যায় না (হোক না বাসস্ট্যান্ড বা পাসপোর্ট দপ্তর), কোনো বস্তিতে আশ্রয় পাওয়া যায় না, কোনো মালামাল একখান থেকে আর একখানে স্থানান্তর করা যায় না, সর্বত্র মস্তানদের বা চাঁদাবাজদের সন্তুষ্ট করতে হয়। ছিনতাই, চাঁদাবাজি, যানজট, পরিবেশ দূষণ, কারখানা বন্ধকরণ– সর্বত্রই মূল কারণ হলো আইনশৃঙ্খলার একান্ত অভাব। পুলিশের কাছে নালিশ প্রদান হলো ভয়ঙ্কর বিষয়। খবরের কাগজের প্রধান পরিবেশনা হলো সন্ত্রাসের বড়ো বড়ো কাহিনী, সন্ত্রাসীর জীবনকাহিনী। ইউলিসিসের অডিসি থেকে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর হলো এরশাদ সিকদারের হত্যাযজ্ঞ। বেশ কজন বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে, অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্বের প্রধান কারণ আইনশৃঙ্খলার বিপর্যয় ও সন্ত্রাসের সর্বগ্রাসী থাবা। একমাত্র আশার আলো নাকি দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশে লুটেরা, ডাকাতদের দমন। অবশ্যি সেখানেও অ্যামন্যাস্টির ভবিষ্যৎ প্রতিফলন নিয়ে শঙ্কার অবকাশ রয়েছে।

বিজয়ের মাসে উচ্ছ্বাসে আমার বেশ ভাটা যে পড়েছে তা অস্বীকার করতে পারি না। সব বিবেচনায় যে হতাশা বড়ো ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে তা নিরসনের চাবিকাঠি কিন্তু মূলত সরকারের হাতে। সংলাপের পথ প্রশস্ত না হলে আমরা শুধু ব্যথিতও হই না, হতাশও হয়ে যাই। তেমনি সহিংসতা ও বিদ্বেষ আমরা শুধু ঘৃণা করি না, তাতে নিদারুণ ক্ষুব্ধও হই।

*১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯, ভোরের কাগজ*



www.pathagar.com

# বিজয় মাসের বাণী ও প্রত্যাশা

ডিসেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে বিজয়ের মাস। ১৯৪৭ সালে এই ডিসেম্বরেই করাচির শিক্ষা সম্মেলনের লিংগুয়াফ্রাংকা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে সূচিত হয় এদেশের ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৮ সালে এই ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ গৃহীত হয়। আর এই সনদ মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। ১৯৭১ সালে এই মাসেই আমাদের বিজয়। ৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আমরা প্রথম কূটনৈতিক স্বীকৃতি পাই। ১০ই ডিসেম্বর আমরা দখলদার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গঠন করি ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ড। ১৬ই ডিসেম্বর রমনার রেসকোর্সে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি দস্যুবাহিনী আত্মসমর্পণ করে যৌথ কমান্ডের কাছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম দানা বাঁধে ১৯৪৮-এ, ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক ভূমিকার অভাব আমাদের সামনে নিয়ে আসে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কার্যক্রম। ১৯৫৩ সাল থেকে প্রচ্ছন্ন ও ১৯৫৮ সাল থেকে প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তাদের দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং জাতীয় সংসদের অধিবেশন বন্ধের কারণে আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়। ২৫শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন অতর্কিতে নিরস্ত্র জনতার ওপর হামলা করলো তখনই আমরা মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হই।

॥ ২ ॥

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধাপে ধাপে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবিকে এগিয়ে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পর্যবসিত করেন। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে তিনি ছয় দফার সমর্থনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। ৩১৩ আসনের জাতীয় সংসদে ১৬৭টি আসন লাভ করেন। ১৯৭১-এর ৩রা জানুয়ারিতে তিনি ঢাকায় মহাসমাবেশ করে



www.pathagar.com

নিশ্চিত করলেন সে, ভবিষ্যতের সংবিধান ছয় দফার ভিত্তিতে প্রণীত হবে। সারা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি জুড়ে চলল সব গোষ্ঠী, সব দল, সব মতের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপ। তার দাবি–আশু সংসদ অধিবেশন যাতে বারো বছর পর সামরিক শাসনের কবল থেকে দেশ মুক্ত হয়। অবশেষে ১৩ই ফেব্রুয়ারিতে সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া জাতীয় সংসদ অধিবেশনে মূল্যবান ঘোষণা প্রদান করলেন। ৩রা মার্চে সংসদ অধিবেশন বসবে। সংসদ সর্বোচ্চ ১শ' ২০ দিনে সংবিধান প্রণয়ন করবে এবং তখনই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে।

কিন্তু সেই তখনই শুরু হলো পশ্চিম পাকিস্তানি স্বার্থান্বেষীদের ষড়যন্ত্র। পরিণতিতে ১লা মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য সংসদ অধিবেশন স্থগিত করা হলো। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে পরিপক্ব নেতা বঙ্গবন্ধু তখন ঘোষণা করলেন অসহযোগ আন্দোলন। ৭ই মার্চের রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তিনি জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে সমঝোতার হাত বাড়িয়ে দিলেন নির্বোধ শাসকগোষ্ঠীর কাছে। মার্চের পঁচিশ দিন প্রস্তুতির সময়। স্বশাসনে জাতি প্রশিক্ষিত হলো। সহিষ্ণুতা ও শৃঙ্খলায় জাতি হলো দীক্ষিত। দাবি আদায়ে ও হামলার প্রতিরোধে জাতি হলো বদ্ধ পরিকর। পাকিস্তানিরা কখনো ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা নেয় সামকিক প্রস্তুতি। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রস্তুতি ছিল রাজনৈতিক প্রতিরোধ। অতর্কিত সামরিক হামলায় বঙ্গবন্ধু ২৬শ মার্চে দিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা। দশই এপ্রিলে বাংলাদেশের জন প্রতিনিধিরা মুজিবনগরে গ্রহণ করলেন স্বাধীনতা ঘোষণা– "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক বিচার নিশ্চিতকরণ" হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্য।

বিজয়ের আনন্দ স্বভাবতই অনেক দুখ–শোককে ম্লান করে দেয়। তিরিশ লাখ শহীদের আত্মদান, তিন লাখ মা-বোনদের মর্যাদাহানি, দুর্বল অর্থনীতির এক-তৃতীয়াংশের ধ্বংস সাধন, সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয় এবং মূল্যবোধের ধ্বংস- সব ছাপিয়ে ছিল বিজয়ের উল্লাস। বাংলাদেশে সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও সেই অনুভূতি আঁচ করতে অসুবিধা হয় নি। মাস দেড়েক পরে দেশে ফিরেও সেই আমেজটি দেখেছি। দুর্ভাগ্যবশত শোক-দুঃখের শেষ কিন্তু তখনো হলো না। ১৮ তারিখ জানলাম যে, ১৪ তারিখে পরাজয় অবধারিত জেনে বেজন্মা আল বদর গোষ্ঠী দেশের বাছাবাছা কতিপয় শ্রেষ্ঠ সন্তানকে পৈশাচিক আনন্দে হত্যা করেছে। এই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কাহিনী একদিকে শোক এবং অন্যদিকে ক্ষোভের



www.pathagar.com

সঞ্চার করে। এঁদের নিশ্চয়ই জাতি ভুলে যায় নি, কিন্তু তাঁদের মর্যাদা কি সমুন্নত রাখতে পেরেছি?

কলাম লেখা শুরু করার পর ডিসেম্বরে সবসময়ই কিছু লিখতে চেষ্টা করেছি। তবে শেষ লেখা লিখেছি ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ সালে। ২০০০ সালে বিদেশে কাজে ব্যস্ত থাকায় তা হয়ে ওঠে নি। পুরনো কাগজ দেখে বুঝি যে, '৯৮ ও ৯৯ দু' বারই ক্ষোভ প্রকাশ করেছি, তবে হতাশ হই নি। নিজেদের অর্জন নিয়ে গর্ববোধ করেছি, তবে ব্যর্থতার জন্য নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছি। আমার সে সময়কার ভাবনা ছিল মোটামুটি এই রকম : "মানুষের ক্ষমতায়নে আমরা ব্যর্থ হয়েছি, যদিও পরাধীনতার অপবাদ অপসারণ করেছি। মৌলবাদ ও ধর্ম নিয়ে রাজনীতি আমরা নির্মূল করতে পারিনি যদিও উদারনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছি। আইনের শাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা এখনো সোনার হরিণ, যদিও আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই রয়েছে। একটি ধনী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু বিনিয়োগে বন্ধাত্ব যায় নি ও মানুষের অভাব ও বঞ্চনার কমতি হয় নি।"

॥ ৪ ॥

২০০১ সালে আশাতীভাবে রাজাকাররা ও মায় আল বদরের পাণ্ডারা হয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার। নির্বাচনের জালিয়াতি বিবেচনা করে, নির্বাচনোত্তরকালে সংখ্যালঘু নির্যাতন অবলোকন করে এবং বিএনপি-জামাতের রাজনৈতিক বিদ্বেষ ও হিংস্রতা অনুধাবন করে বস্তুতই সম্বিত হারিয়ে ফেলি। এক ধরনের অনুভূতিহীন স্থবিরতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাই। ২০০২ সালে সেই অনুভূতিহীন স্থবিরতা নিঃশেষ হয়ে যায় নি। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গভীর ক্ষোভ এবং নিদারুণ দ্রোহ। তাই দুই বছর নীরব থেকে বিজয়ের মাসে আবার লেখনী ধরেছি। বিএনপি জামাতের এক বছরের দুঃশাসন আমাদের বিজয়টাই যেন ব্যর্থ করার তালে আছে। এবার একসঙ্গে তাই নানা প্রশ্ন ভিড় করে আসছে।

গণতন্ত্রের জন্য ছিল আমাদের বিজয়- এই কি সেই গণতন্ত্র? মানবাধিকারের জন্য আমরা যুদ্ধ করেছিলাম– কোথায় সেই মানবাধিকার?

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ছিল আমাদের সংগ্রাম– স্বৈরাচারের এর চেয়ে জঘন্য রূপ আর কি হতে পারে? আইনের শাসন আমরা চেয়েছিলাম– এটা কি ধরনের আইনের শাসন?



www.pathagar.com

রাজনৈতিক বিকাশ ছিল আমাদের লক্ষ্য–রাজনীতিবিদদের মায় সাংসদের নির্যাতন, গ্রেফতার এবং রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার হুমকি কি তার পরিণাম?

॥ ৫ ॥

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের প্রধান সমস্যা বা নীতিমালা সংসদে বিবেচিত হবে। আইন-শৃঙ্খলার দূরবস্থা যার জন্য সেনাবাহিনীকে তলব করতে হয়েছে তা কি আমাদের সংসদে একটুখানি আলোচিত হয়েছে? বিনা ওয়ারেন্টে, বিনা মামলায়, বিনা অভিযোগে যে কাউকে আটক করে তারপর মামলা বা অভিযোগ সাজানো তো হলো অনির্দিষ্ট মৎস্য শিকার অভিযান। নিরীহ অধ্যাপক কলাম লেখক মুনতাসীর মামুনকে গ্রেফতার করা তো বাকস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে হত্যার শামিল। সাবের চৌধুরী আর শাহরিয়ার কবিরকে এক দফা মৎস্য শিকারের আওতায় এনে ফল হয় নি, দ্বিতীয় দফায় তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ৫৪ ধারায় রিমান্ডের সম্ভাবনা আমরা চিন্তাও করতে পারতাম না।

মানবাধিকারের পরিবর্তে আমরা পেয়েছি হীরক রাজার দেশ। সর্বোপরি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে মৃত্যু হলো বর্বর ব্যবহারের চূড়ান্ত নিদর্শন। এতে তো রাষ্ট্রযন্ত্র আর সন্ত্রাসীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য রইলো না। এমন বেআইনি ও অসভ্য কাণ্ড-কারখানা আমাদের যেন আন্দোলিতই করে না। একাত্তরে আমরা বলতাম, এই দেশে আইন নেই, আছে শুধু সামরিক অত্যাচার। আজ মনে হচ্ছে, দেশে আইন নেই আছে সরকারের অত্যাচার। উচ্চতম আদালত জামিন দেয়, নির্যাতন না করতে বলে, গ্রেফতার অবৈধ ঘোষণা করে। কিন্তু নিম্ন আদালত তা মানে না, প্রক্রিয়াগত জটিলতার ধুয়া তুলে আদেশ অমান্য করে এবং আদালতের সহায়ক অভিশংসনকারী উকিল এই বেআইনি কাজে ইন্ধন যোগায়।

বলা হয়েছে যে, সেনাবাহিনীকে ডাকা হয়েছে ফৌজদারি প্রসিডিউর আইনের ১২৯-১৩১ ধারার আওতায়। এটাতো একেবারে ভুয়া অজুহাত-কোথায় সেই বেআইনি বা উশৃঙ্খল সমাবেশ। সেনাবাহিনীকে ডাকা হয়েছে বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য এবং সরকার সবসময় সে ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু তাতে প্রচলিত সাধারণ আইন মেনে চলতে হবে, কাউকে ধরতে গেলে ওয়ারেন্ট লাগবে, অভিযোগ লাগবে, মামলা লাগবে। কাউকে নির্যাতন করা যাবে না, কানে ধরে উঠবস করা যাবে না, মানুষের অমর্যাদা



www.pathagar.com

করা যাবে না। আদালতের বিধিনিষেধ মানতে হবে। কিভাবে এ অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের বিজয় উৎসব করবো?

॥ ৬ ॥

স্বৈরাচার বা সামরিক শাসন পরিহারের উপায় হলো রাজনৈতিক বিকাশ। আমাদের গতি হচ্ছে রাজনৈতিক তমসার পথে। রাজনীতিবিদদের অসম্মান মায় দৈহিক নির্যাতন আমরা অহরহ করে যাচ্ছি। বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা আমাদের রাজনৈতিক ধর্ম। শুধুমাত্র প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য অবলীলায় মিথ্যাচার চলে। রাষ্ট্রদ্রোহ একটি বড় বিষয়। কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার হাটে-বাজারে রাষ্ট্রদ্রোহ খুঁজে পাচ্ছে বলে মনে হয়। আমার জানামতে ভাবমূর্তি বিনষ্টের বিষয় শুধুমাত্র স্বৈরাচারী ও সামরিক সরকারকে বিচলিত করে। গণতান্ত্রিক সরকার ভাবমূর্তির বিষয়টি তুলে ধরে তার প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড দিয়ে। ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের অপরাধের ভয়ে ইরানের শাহের আমলে প্রতিবাদকারীরা মুখোশ পরে বিক্ষোভ করতো। ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের অপবাদ দিয়ে ইয়াহিয়া খান একটি জাতিকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলতে দ্বিধা বোধ করেন নি। ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য আমাদের জেনারেল এরশাদ আমাকেই বিচারের হুমকি দিয়েছিলেন। এখন মনে হচ্ছে আমরা আবার সেই স্বৈরাচারী বা সামরিক শাসনের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত। মজার ব্যাপার হলো যে, তাতে উচ্চকণ্ঠ ভূমিকা পালন করছে কিছু বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক।

আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় যখন দেশটি হয় সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য। আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় যখন সংখ্যালঘু নিগৃহীত হয় ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা হারায়। আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় যখন সাংবাদিক হত্যা হয় বা হুমকির মুখে পড়ে। আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় যখন নির্বাচিত পৌর কমিশনারদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের বহর লাগে। আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় যখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে কেউ মারা যায়। আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় যখন ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর বা সাবের চৌধুরী বা শাহরিয়ার কবির বা বাহাউদ্দিন নাসিমের মতো ব্যক্তি তাদের গ্রেফতারকালীন সময়ে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করেন। আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় যখন কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বিনা প্রমাণে রাষ্ট্রদ্রোহ বা সন্ত্রাসের অভিযোগ ঘোষণা করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক ভাষণ দান করেন। আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় যখন প্রভাবশালী কেউ নিজেকে সন্ত্রাসী বলে পরিচয় দেয়। বোমা ফাটে বা



www.pathagar.com

সাতক্ষীরায় মেলা বোমায় আক্রান্ত হয়। আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় যখন বিচারকের মানদণ্ড বিসর্জন দিয়ে কেউ রাজনৈতিক হাস্যকর তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করে। মোদ্দা কথা, দশ বছর না এগারো বছর আমরা রাজনৈতিক শিষ্টাচারের প্রথম পাঠটিও গ্রহণ করি নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার বিসর্জন দিয়ে আমরা ষোল বছরের সামরিক স্বৈরাচারের পাঠ নিয়েছি।

॥ ৭ ॥

আমি দলীয় রাজনীতিতে অংশ নেয়ার পর কলাম লেখা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছি। কিছু বললেই সবাই বলবে যে, একটি দলীয় মতবাদ। আর আমিও হয়তো দলের ভাবধারাকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারবো না। তবে বিজয়ের মাসে বর্তমান সংঘাতময় পরিস্থিতিতে আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। আমি স্থির নিশ্চিত যে আমরা অচিরেই রাহুমুক্ত হবো।

বিএনপি জামাত সরকারের এক বছরে সন্ত্রাসের যে ব্যপ্তি হয়েছে, নির্যাতনের যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে এবং আইন-শৃঙ্খলা ও সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অবক্ষয় হয়েছে, তাতে মুক্তির পথ জনগণ বেছে নেবেই। সন্ত্রাস এদেশে মুষ্টিমেয় লোকের পেশা এবং তাদের দৌরাত্ম্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়ই চলে। সে পৃষ্ঠাপোষকতা রাজনৈতিক যেমন হয়, তেমনি হয় প্রশাসনিক বা স্থানীয় স্তরে। সন্ত্রাস দমনে যেকোনো বাহিনীই সরকার প্রদত্ত বিবরণ বা ফর্দ অনুযায়ী কাজ করতে হয়। সুতরাং সন্ত্রাস নির্মূলে সরকারি উদ্যোগ ব্যর্থ হবেই। অথচ ডিসেম্বরের বিজয় কখনো সার্থক হবে না যতদিন না সমাজ সন্ত্রাসমুক্ত হয়। সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক শিষ্টাচার সহাবস্থান করতে পারে না। সন্ত্রাস এবং আইনের শাসনের সহাবস্থান অচিন্তনীয়। তাই সন্ত্রাসকে যেতে হবে, তাদের দোসরও সেই স্রোতে ভেসে যাবে।

আমাদের জনগণ খুবই নির্বিরোধী নীরব, শান্তিপ্রিয়, অল্পে তুষ্ট এবং অসীম সহনশীল। কিন্তু আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে আমরা গর্জে উঠি। ডিসেম্বর আমাদের জন্য আত্মবিশ্লেষণের সময়, আমাদের আত্মপ্রত্যয় পুণর্বিবেচনার মাস। আমরা গণতন্ত্রের হত্যা, মানবাধিকার দলন, আইনের অবমাননা এবং সরকারি নির্যাতন– এসব অনাচার মানতে পারি না। এই হলো বিজয়ের মাসের বাণী, এই হলো বিজয়ের মাসের প্রত্যাশা।

*বিজয় দিবস সংখ্যা ২০০২, সংবাদ*



www.pathagar.com

# বিজয় দিবসের প্রত্যয়

বত্রিশ বছর আগে এই মাসে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। তখন আমাদের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৬৯ মিলিয়ন (ছয় কোটি নব্বই লাখ)। বর্তমানে আমাদের জনসংখ্যা ১শ' ৩৩.৫ মিলিয়ন অথবা ১৩ কোটি ৩৫ লাখ। প্রায় দ্বিগুণিত এই জনসংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রয়েছে। ৬৭ শতাংশের জন্ম হয়েছে একাত্তরের পর এবং আরো ১৪ শতাংশের বয়স ছিল আটের নিচে। তাই বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে সরাসরি জানাশোনা আছে মাত্র আড়াই কোটি নাগরিকের।

বাংলাদেশে জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের প্রক্রিয়া ছিল অনন্য ও অসাধারণ এবং তারপর প্রতিবিপ্লব ছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং ইতিহাস বিকৃতিতে সবিশেষ পারদর্শী। একটি গোষ্ঠী শুরু থেকেই ইতিহাস হাইজ্যাকের প্রচেষ্টায় হয় তৎপর। জাতিরাষ্ট্রের বিকাশ যেকোন দেশে একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং তাতে বাধবিপত্তি ও চড়াই-উৎরাই স্বাভাবিক। আমাদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি ছিল প্রায় হাজার বছরের এবং মধ্যপথে বিবর্তনও হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের ৪টি প্রধান ধর্ম এই ভূখণ্ডে প্রভাব বিস্তার করেছে। মাৎস্যন্যায়ের শেষে ছিল বৌদ্ধ সাম্রাজ্য। তারপর আবার হিন্দু রাজত্ব। অতঃপর মুসলিম শাসন। আবার খ্রিস্টান ব্রিটিশ সরকার। এই রাজশক্তি পরিবর্তন রাজনৈতিক আচার– আচরণ, প্রশাসন, ভূমি ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন সাধন করেছে। কালস্রোতে অর্থনীতিতে এসেছে বিবর্তন, সমাজের কাঠামো বদলে গেছে। তবে ভাষাভিত্তিক জাতি বিকাশ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে রয়েছে অবিচ্ছিন্ন। তার ফলে এই দেশে গড়ে উঠেছে ভাষাভিত্তিক একটি যৌগিক সমাজ। আবার একই ভাষাভাষীরা বিভক্তও হয়েছে। ছড়িয়েও পড়েছে। তবে আমাদের এই বাংলাদেশেই তারা নিজস্ব স্বকীয়তা ঘোষণা করেছে ও প্রতিষ্ঠা করেছে। এই প্রক্রিয়া অন্যান্য সমাজেও হয়েছে। জার্মানির বাইরে জার্মান ভাষাভাষী রয়েছে। স্পেনের বাইরে স্প্যানিশ ভাষাভাষী রয়েছে।



www.pathagar.com

আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে যে, অনেকেই এই দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া জানতে চায় না বা জানে না অথবা সরাসরি অস্বীকার করে জাতি বিকাশের অধ্যায় বিশেষকেই সম্পূর্ণ ইতিহাস বলে গণ্য করেন। তার সবচেয়ে প্রকট ও উদ্ভট দাবিটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকে জাতি গঠনের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলে বিবেচনা করার প্রবণতা। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চে ও তারপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কতিপয় বাঙালি সেনাপতি এবং সেনা ইউনিট বিদ্রোহ করে জনগণের প্রতিরোধে যোগ দেন। তাদের কেউ কেউ হয়ে গেছেন জাতিসৃষ্টির দাবিদার। হাজারতরো সৈন্য এবং শত দুয়েক সেনাপতি দেশকে শুধু স্বাধীনই করেন নি বরং তারা স্বাধীনতার সুদীর্ঘ ইতিহাসও রচনা করেছেন বলেই দাবি করা হয়। ১৯০৬ সাল ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা পায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে। কেউ কেউ মনে করেন ওইতো 'জাতিগঠনের সূচনা।' ১৯৪০ সাল শেরে বাংলা ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেন এবং ১৯৪৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী 'এক পাকিস্তানের' প্রস্তাব পাকা করেন। সেই ব্যাপারটি কারো বিবেচনায় জাতিরাষ্ট্র গঠনের মুখ্য বিষয়। ছাত্ররা ১৯৪৮ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে। ১৯৫২ তে সেই দাবিতে তারা শাহাদাত বরণ করে এবং ১৯৫৬ সালে সেই স্বীকৃতি আদায় করে। কারু বিবেচনায় এই অধ্যায়টিই হয়ে গেছে জাতি গঠনের সূচনা পর্ব। ১৯৫৬ সালে অর্থনীতিবিদরা পাকিস্তানে দুই অর্থনীতি তত্ত্বের অপরিহার্যতা তুলে ধরেন। কিন্তু তারপরও অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। কেউ মনে করেন এইটিই ছিল জাতিরাষ্ট্র উদ্ভবের আন্দোলন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ঘোষণা করেন আমাদের বাঁচার দাবি হিসেবে। কেউ বলতে পারেন এখানেই আমাদের স্বাধীনতা ইতিহাসের শুরু। কিন্তু মার্শাল আইয়ুব খানের দীর্ঘ ১১ বছরের সামরিক শাসন, রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণ ও বিশেষ করে বাঙালিদের অংশগ্রহণ বিঘ্নিত করে তার বিরুদ্ধে গণজোয়ারের সৃষ্টি করে। তখনই তো শুরু হয়ে যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে '৭১-এর ১৭ই জানুয়ারিতে সারা পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়ন যখন পাকিস্তানের সামরিকজান্তা বানচাল করে দিল তখনই তো শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ যার বিভিন্ন পর্ব ছিল অসহযোগ আন্দোলন, সংলাপ এবং মুক্তিযুদ্ধ। কতভাবেই না জাতিরাষ্ট্র অভ্যুদয়ের কাহিনী রচনা করা যায়।

ইতিহাসের সুদীর্ঘ কলেবরে অবশ্যই কতিপয় মাইলফলক সহজেই চিহ্নিত করা যায়, যার ধারাবাহিকতায় ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে এই ভূখণ্ডে



www.pathagar.com

আমরা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করি। এই প্রক্রিয়ার সূচনা হয় সপ্তম শতাব্দীতে বাংলাভাষার আবির্ভাবে। এই প্রক্রিয়ার উপাদান ছিল প্রধানত ৩টি ধর্মের প্রভাব বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলাম। এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে দিয়েছে এই ভূখণ্ডের নানা এলাকার ধারাবাহিক একীভূতকরণ। লক্ষ্মণ সেন হন গৌড়েশ্বর, শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ সালে হন শাহ এ বাংগালা। ১৪৪৯ থেকে ১৪৯২ পর্যন্ত পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের পর আসে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের ধর্মনিরপেক্ষ সুবর্ণ যুগ। পরবর্তী মাইলফলক হচ্ছে মোগল আমলে (১৬১৩-১৭৫৭) বাংলার সুবেদারদের স্বায়ত্তশাসিত ধনধান্যে পল্লবিত সুবা বাংলা। ব্রিট্রিশ আমলেই আধুনিক জাতীয়তাবাদ সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠা পায়। এ সময় দেখি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙালি মুসলমানদের বাংলা ভাষায় নতুন করে দীক্ষা। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তাদের রাজনৈতিক চেতনার শুরু। আর ১৯২৩-২৫ সময়ের বেঙ্গল প্যাক্টে দেখি একটি যৌগিক জাতি গঠনের সুন্দর নির্দেশনা। পরবর্তী পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ও বিভক্তিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাংলায় মুসলমানরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় পালন করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তবিকই বিনিশ্চায়ক ভূমিকা। কিন্তু সেই ভারত বিভাগকালে আবার দেখি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসুর যুক্ত বাংলা উদ্যোগ। তারপরের ইতিহাস পর্যালোচনা করা তত জটিল বা কঠিন নয় যদিও গোষ্ঠীস্বার্থের খাতিরে পরিকল্পনা করে ইতিহাস বিমুখতা এই দেশে জোরেশোরে বহাল করা হচ্ছে।

ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানের দু'টি অঞ্চলে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল চমৎকার; কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন ছিল উচ্চতর আদর্শের ও মানবসেবায় নিবেদন। পরিবর্তে আমরা দেখলাম ভাষা আমাদের এক নয়। রাজনৈতিক চেতনা সম্পূর্ণ আলাদা। গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য একেবারে ভিন্ন মাত্রায়। জনসেবার আদর্শ একেবারে পৃথক– এক এলাকায় সমতার আদর্শ সর্বোচ্চ, অন্যত্র গোষ্ঠীস্বার্থ প্রধান। মানবসেবার আদর্শও ভিন্ন। গোষ্ঠীর স্বার্থ, ধর্মের সেবা, প্রতিপত্তিশালী সামন্ত গোষ্ঠীর উন্নয়ন হলো এক অঞ্চলের লক্ষ্য। বাংলাদেশ তাই সমাধান খুঁজলো স্বায়ত্তশাসনে– তুমি বাঁচো আমিও বাঁচি নীতিতে। ২৩ বছরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নানা আন্দোলন বিক্ষোভ, নানা তত্ত্বকথা ও সংলাপ অবশেষে যেন একটি সমঝোতার পথ পেল– বাঙালির মহাসনদ হয় ৬ দফা। নির্বাচন ৬ দফাকে মহাসনদে পরিণত করলো। কিন্তু তখনই হলো বিপদ। তবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়



www.pathagar.com

বিশ্বাসী ও অভ্যস্ত বাংলাদেশ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংঘাত এড়বার লক্ষ্যে কিছুই বাকি রাখলো না। অসহযোগ আন্দোলনকালেও সংলাপ অনবরত চালিয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল কোন সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি থেকে বিরত থাকলো। জনগণের ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রত্যয় ছিল এই সংগ্রামের ভিত। বাস্তবে এই দৃঢ় প্রত্যয় এবং পাকিস্তানি অত্যাচারই বয়ে আনে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য।

বিংশ শতাব্দীতে সশস্ত্র যুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রচ্ছেদন প্রক্রিয়ার সাফল্য শুধুমাত্র বাংলাদেশেই ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একমাত্র বাংলাদেশেই আজ পর্যন্ত গণহত্যার বিচার হয় নি। এই বিচারে আসামি হলো পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশের রাজাকার গোষ্ঠী। বাংলাদেশে অতি অল্প সময়ে প্রতিরোধের সাফল্যের পেছনে রয়েছে প্রতিবেশী ভারতে বাংলাদেশের আশ্রয় এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অবশেষে মুক্তিবাহিনীর সমর্থনে সক্রিয় হস্তক্ষেপ। শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের বিজয় ছিনিয়ে নেবার বন্দোবস্ত করে নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটি। কোন মতে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করে তারা পাকিস্তানের পলায়ন ও সার্বভৌমত্বের বিলম্বায়নে ব্যর্থ হয় শুধু সোভিয়েট রাশিয়ার তিনটি উপর্যুপরি ভোটের কারণে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে আরেকটি বিশেষত্ব হলো যে, পাকিস্তানের সঙ্গে ছেদনে সারাদেশ ছিল ঐক্যবদ্ধ। রাজাকার গোষ্ঠীতে ছিল স্বার্থস্বেষী কতিপয় মৌলবাদী, গুণ্ডা বদমায়েশ গোষ্ঠীর দুশ্চরিত্র কিছু ব্যক্তি, পাকিস্তানপন্থী এক গোষ্ঠী অবাঙালি এবং দখলদার বাহিনীর খরিদ করা কিছু ক্রীতদাস। এদের অনেকেই রাতারাতি ভোল পরিবর্তন করে, উচ্চ পর্যায়ের ক্রীতদাসরা প্রায় সবাই বিদেশ পাড়ি দেয়, অন্যরা তওবা করে জীবন রক্ষা করে। অবাঙালিদের রক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার নেয় এবং আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থা তাতে সাহায্য করে। এদের অনেকে ৩২ বছর পরও তাদের দেশ পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় আছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে আর একটি অনন্য বিষয় ছিল দখলদারদের বর্বরতা। গণহত্যার কথা আগেই বলা হয়েছে। নয় মাসে ৩০ লাখ হত্যা ও আড়াই লাখ মহিলার শ্লীলতাহানি বাস্তবেই অসাধারণ ব্যপার। কিন্তু বর্বর দখলদাররা দেশটিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে যায়। ৯ মাসের যুদ্ধে জাতীয় সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস করতে সক্ষম হয় পাকিস্তানের দস্যু দল। এবং পরাজয়ের মুহূর্তে তারা পরিকিল্পিতভাবে দেশের শ্রেষ্ঠ পেশাজীবীদের নির্মূল করবার ব্যবস্থা নেয়। শুধু ঢাকার বধ্যভূমিতে নয়, সারাদেশব্যাপী বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী নিধনের এক অসভ্য



www.pathagar.com

হোলিখেলায় দখলদার বাহিনী ও তাদের অমানুষ সহচর আলবদর ও আলশামস লিপ্ত হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কতগুলো লক্ষ্য দেশের বর্তমান সঙ্কটকালে পুনরাবৃত্তির দাবি করে।

* স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ।

* সংগ্রামটি ছিল ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তাদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেবার প্রতিক্রিয়া ছিল স্বাধীনতা ঘোষণা।

* মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য। তড়িঘড়ি করে রচিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে এই বিষয়ে ছিল স্পষ্ট উচ্চারণ। সম্ভবত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাই জাতিসংঘ সনদের প্রতি অঙ্গীকার একমাত্র একটি ঘোষণা।

* জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ছিল স্বাধীনতা ঘোষণার দৃঢ় কর্তব্য।

* স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল ধর্ম নিয়ে রাজনীতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র অবস্থান। মুক্তিযুদ্ধ ছিল ধর্মান্ধ ধর্মব্যবসায়ী পাকিস্তানি শক্তির বিরুদ্ধে সারা বাঙালি জাতির যুদ্ধ।

* স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদ। সমাজে সমতা ও নাগরিকের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন জাগায় স্বাধীনতা যুদ্ধ। বর্তমানের সঙ্কটকালে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হলো যে সক্রিয় রাজাকাররা এখন রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে যাদের বিচার হওয়া উচিত তারা হয়েছে রাজনৈতিক নেতা। তাদের একজনকে ওআইসির মহাসচিব বানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঘুম নেই।

* স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে দেশে সামরিক শাসন জারি হয় এবং সুদীর্ঘ ১৬ বছর এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শাসন দেশের নৈতিক ভিত্তি, দেশের নেতৃত্ব, দেশের প্রগতি ও দেশের রাজনৈতিক প্রশাসনিক কালচার এমন বিপর্যস্ত করে যে তা থেকে আজও আমাদের উত্তরণ হয় নি।

* একনায়কত্ব পুরোপুরি বহাল, শুধু পরিবর্তন হচ্ছে নির্বাচনের মাধ্যমে। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসে লাগাম টানার পরিবর্তে অবক্ষয় অব্যাহত। বর্তমানে তৃতীয় শক্তির নামে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। আমরা আশা করবো পুনরায় সাময়িক শাসনের পাঁয়তারা যেন কোনমতেই শুরু না হয়।

* ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এখনো অব্যাহত। পেশী ও অর্থের প্রভাব এবং নির্বাচনী জালিয়াতির ষড়যন্ত্র পরিহারের জন্য উপায় আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।



www.pathagar.com

* মানবাধিকারের বিপর্যয় এখন সারাবিশ্বে। আমাদের দেশে এই বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে মৌলবাদী গোষ্ঠী। জীবনের নিশ্চয়তা যেখানে নেই মানবাধিকার সেখানে ভুলুণ্ঠিত হবেই। অপারেশন ক্লিনহার্ট, র‍্যাব, বিশেষ নিবর্তনমূলক অসংখ্য আইন, ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও রিমান্ড, হাজতে মৃত্যু এখন বাংলাদেশে নিত্যনৈমেত্তিক বিষয়। এই অবস্থার গুণগত পরিবর্তন আমাদের অঙ্গীকার।

* জাতিসংঘ সনদ আমরা নির্বিচারে অবহেলা করি। আইসিসি থেকে দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে আমরা রাষ্ট্রকে অব্যাহতি দিই। সিডো আমরা পুরোপুরি মানি না। অন্তত জাতিসংঘের ছাতার অধীনে যেন আমরা শান্তি মিশন বা পুনর্বাসন কার্যক্রমে জড়াই। এই সামান্য আশাটি অবশ্যই করবো।

* মানবাধিকার যেখানে ভুলুণ্ঠিত এবং উন্নয়নের মূল কৌশল যেখানে বিত্তশালীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি, সেখানে জনগণের সমতা, অথনৈতিক মুক্তি, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্রই কথার কথা। অন্তত সরকারকে যদি জনগণের দুয়ারে নেয়া যায় তবু অর্জনের রাস্তা মিলবে। নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে জেলায় জেলায় স্থানান্তরের উদ্যোগ আমার একান্ত আবেদন।

* ধর্ম যেন আমাদের রাজনীতির মধ্যমণিতে পরিণত হয়েছে। ধর্মভিত্তিক দু'টি দল এখন ক্ষমতায় রয়েছে। ধর্মকে যত্রতত্র ব্যবহার জোট সরকারের নির্ধারিত কৌশল বলে মনে হয়। এই বিবর্তন দেশে জঙ্গিবাদীদের তৎপর করেছে। দেশে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চাকে পশ্চাৎমুখী করেছে। দেশে সাংঘাতিকভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়েছে। রাষ্ট্রকর্মকে ধর্ম থেকে পৃথকীকরণের জন্য দৃঢ় উদ্যোগের অপেক্ষায় আছি। অবশ্যি জোট সরকার আমলে এমন উদ্যোগ যে হতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবি না।

আমি বিশ্বাস করি যে, প্রতিটি জাতির কিছু মজ্জাগত মূল্যবোধ রয়েছে। সেই মূল্যবোধ বাংলাদেশে সহস্র বছরের প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সেই মূল্যবোধ স্বাধীনতা সংগ্রামের কষ্টিপাথরে পাকা হয়েছে। প্রতিবিপ্লব বিপর্যয় ডেকে এনেছে; কিন্তু পরাজিত করতে পারে নি। জোট সরকার যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে জাতির ইতিহাসের নিরিখে তা নিতান্তই সাময়িক। উত্তরণ আমাদের হবেই। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। জয় বাংলা।

*বিজয় দিবস সংখ্যা ২০০৩, সংবাদ*



www.pathagar.com

# ২০০৬ সালের মার্চ

ডিসেম্বর, ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাসে কিছু না কিছু বলতে বা লিখতে ইচ্ছে করে। নব্বই-এর দশকে যখন কয়েকজন সম্পাদকের উৎসাহে কলাম লেখা শুরু করলাম তখন থেকেই এই ঔৎসুক্য। অধুনা রাজনীতিতে ব্যস্ততা এই সুযোগটি অপহরণ করেছে। তবুও মাসটি তো মার্চ তাই এই প্রচেষ্টা।

২০০৬ সাল শুরু হয়েছে খালি সঙ্কটের আবর্তে। আমাদের দেশ পরিচালনায় যে সরকার বহাল সেটা যে দুর্বৃত্ত ও রাজাকার তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এমন যে অপদার্থ ও অদক্ষ সে ধারণাটি এত প্রকট ছিল না। সচরাচর যারা লুটপাট ও ঘুষ চুরিতে পারদর্শী তাদের দুষ্টবুদ্ধি প্রখর এবং তাদের দক্ষতাও আছে। কিন্তু খালেদা-নিজামী দুর্বৃত্ত গোষ্ঠীর সেই দক্ষতাও নেই। সম্ভবত এ কারণেই তাদের লুটপাট এমন নজিরবিহীন। চীফ হুইপের কাণ্ডকারখানা এতই অবিশ্বাস্য! বছরের শুরুতেই দেখা দিল সার সঙ্কট, ডিজেল সঙ্কট, বিদ্যুৎ সঙ্কট ও সেজন্য হত্যাকাণ্ড এবং বিমান পরিবহন সঙ্কট। খালেদার পদাঙ্ক এবং সম্ভবত হুকুম মেনে মন্ত্রিবর্গ এক সুরে কথা বলতে থাকলেন যে, কোথাও সঙ্কট নেই। সবই সংবাদ মাধ্যমের সৃষ্টি। দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ, অবরোধ এবং কখনো সহিংসতা সার ডিজেল বিদ্যুতের জন্য অনবরত ঘটে যাচ্ছে সেদিকে কারও নজর নেই। তারা কানে শুনে না, চোখে দেখে না। তাদের হৃদয় মনে লেগে আছে তালা।

তবে খালেদা সুকৌশলী। ফেব্রুয়ারির উৎসব ও বইমেলা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। সব বাংলাদেশীর কর্মকাণ্ড বন্ধ রইল। তবে নিরাপত্তার অজুহাতে অগণিত জনগণ নানা বিড়ম্বনা সহ্য করল। জঙ্গীবাদীদের রিক্রুট জামায়াত করলেও তারা এখন খালেদার হাতের পুতুল। কিন্তু সঙ্কটের তো সমাধান হয় না। হবেই বা কেমন করে। আমদানি ঠিক মতো হয় নি। একে তো অর্থ সঙ্কট রিজার্ভ তো যক্ষের ধন তাই খোলাবাজার থেকে পেট্রোলের জন্য অর্থ আদায় করতে হয়। দ্বিতীয় উৎপাদন সঙ্কট- সারের উৎপাদন কমে



www.pathagar.com

গেছে। নতুন প্রকল্প সব আটকে আছে আর বিদ্যুতের বিষয় নাই বা বললাম। তৃতীয় লুটপাটের লাগামহীন কালচারে কোন চুক্তি করা যায় না বা কোন ব্যবসায়ীকে ব্যবসায় লাগানো যায় না। কমিশন আর ঘুষের অত্যাচারে সিদ্ধান্ত হয় না। তাই আমদানিও হয় না। প্রকল্প চালু করা যায় না এবং বিতরণ ব্যবস্থাও পছন্দের ডিলাররা বানচাল করে দেয়। চতুর্থ : এই লুটপাটের রাজাকার সরকার দেশের মঙ্গল চায় না। তাই নতুন ইউরিয়া সার কারখানা তারা স্থাপন করবে না। ডিএপি/টিএসপির প্রকল্প বন্ধ করে দেবে। পুরনো কারখানা মেরামত ও সংরক্ষণ ঠিকমতো করবে না। আমাদের নানা সারের প্রয়োজন মোট ৪০ লাখ টন। আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা ইউরিয়া ২১ লাখ টন আর টিএসপিতে ১৫ লাখ টন। উৎপাদন বাড়াতে রাজাকারদের আগ্রহ নেই এবং থাকাটা স্বাভাবিক নয়।

বিদ্যুৎ খাতে এই সরকারের কর্মকাণ্ড কিংবদন্তিতে জায়গা করে নিয়েছে। খালেদা সরকার ১৯৯১–১৯৯৬ কালেও এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে নি। পূর্বতন সরকারের একটি চুক্তিতে শুধু বিদ্যুৎতায়ন করে তারা রেখে যায় মাত্র ২২০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা, প্রয়োজনের চেয়ে ১০০০ মেগাওয়াট কম। ১৯৯৬–২০০১ আওয়ামী লীগ সরকার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে ৩৮০০ মেগাওয়াটে পৌঁছে। তাছাড়া তারা ১২০০ মেগাওয়াটের প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রেখে যায়। লুটপাটের সরকার এসেই ১২০০ মেগাওয়াটের চলমান প্রকল্প সব বন্ধ করে, কিন্তু চার বছরেও তাদের কমিশন ঘুষের নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হয়। তাই তারা মাত্র ৮০ মেগাওয়াট ক্ষমতা আহরণ করেছে আর সম্ভবত ৩০০ মেগাওয়াট এই বছরে যোগ দেবে। কিন্তু ইতোমধ্যে মেরামত ও সংরক্ষণের অভাবে ও বয়সের ভারে উৎপাদন নেমে গেছে ২৮০০/৩২০০ মেগাওয়াটে। দেশের যে ক্ষতি খালেদা জিয়া (জ্বালানি মন্ত্রী) করে গেলেন তা পূরণ করতে অন্তত আরও চার বছর লাগবে। আমাদের বর্তমানে প্রয়োজন ৫০০০ মেগাওয়াট এবং আরও চার বছরে তা দাঁড়াবে অন্তত ৮০০০ মেগাওয়াট। ভেবে দেখুন শত্রু কে? সুকৌশলী খালেদা খুব ভাল একটি সুযোগ পেয়ে গেলেন। হয় বা তার পছন্দের লোক পাকিস্তানের কৌসুলিরা তাকে যথাযথ বুদ্ধিটিও উপহার দেন। প্রেসিডেন্ট বুশ ভারত–পাকিস্তান সফরে এসেছেন, তাঁকে সন্তুষ্ট করার একটি মওকা পাওয়া গেল। ২০০৫ সালে উন্নয়ন ফোরামের ওয়াশিংটন অধিবেশনের সুযোগ নিয়ে জাগ্রত জনতা ও জামাতুল মুজাহিদীন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তিনি আগেও সুপ্রসন্ন নজর কেড়েছেন। এবার তাঁর দুই পুতুল শায়খ


www.pathagar.com

আবদুর রহমান সন্ত্রাসী এবং সিদ্দিকুল ইসলাম খুনীকে তিনি গ্রেফতার করে ফেললেন। যাক, দুটো শীর্ষ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে অবশ্যই তিনি জনগণকে বেশ আশ্বস্ত করেছেন। কিন্তু আকর্ষণীয় বিষয় হলো নাটকের অবতারণা। পলাতক যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ক্রিমিন্যাল এবং যাদের গ্রেফতারের জন্য রয়েছে মোটা অঙ্কের পুরস্কার তারা পালিয়ে বেড়ায় নিতান্তই বেপরোয়াভাবে। তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার তাদের সঙ্গে থাকে। তাদের কাছে তেমন কোন আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক নেই। তারা মাসের পর মাস একই আশ্রয়ে দিন কাটায়। তাদের ঘেরাও করলে তারা আত্মাহুতির হুমকি দেয়। তাদের গ্রেফতার নাটক প্রচার করার জন্য পছন্দের টেলিভিশন রাতারাতি সক্রিয় ক্যাম্প বানিয়ে নেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার সব প্রস্তুতি আমাদের গণনির্যাতনকারী পুলিশ, র‍্যাব গ্রহণ করে। অতঃপর হয় পর্বতের মূষিক প্রসব। বিড়ালের মতো সন্ত্রাসী ও খুনীদের পরিবার পরিজন আত্মসমর্পণ করে। তারপর তারাও সেই পথ অবলম্বন করে। নিতান্তই মেষশাবক। এরা দু'জনেই শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধী, তাদের বিরুদ্ধে আরও হাজারো মামলা থাকতে পারে। কিন্তু তাদের আদর আপ্যায়ন ও তাদের জন্য সেবা শুশ্রূষা কি খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না।

সুকৌশলী খালেদা জিয়া কিন্তু এক ঢিলেই কেল্লাফতেহ করেছেন। এখন সঙ্কট নিয়ে আর কোন কথাবার্তা নেই। সংসদে তার স্পীকার তো সব আলোচনাই খারিজ করে দেন। খুনী সন্ত্রাসীরা নিত্যনতুন খবর দিচ্ছে এবং তা নিয়েই দেশ মশগুল। আর খালেদা জিয়া মাঠে ময়দানে উন্নয়ন নিয়ে তাঁর মিথ্যা বক্তব্য দিয়েই চলেছেন। খালেদা জিয়ার উন্নয়ন অবশ্যই কৃতিত্বের বিষয়।

তাঁর উন্নয়নের জোয়ারে টাকার ক্রয়ক্ষমতা নিদারুণ হ্রাস পেয়েছে যেখানে ৫৩ টাকায় ১ ডলার পাওয়া যেত এখন লাগে ৭২ টাকা। যেখানে ১১ টাকায় এক কেজি চাল পাওয়া যেত এখন তাতে লাগে ২০ টাকা। যেখানে চিনির দাম ছিল ২৮ টাকা এখন তা হলো ৬৩ টাকা।

তাঁর উন্নয়নের জোয়ারে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩৮০০ মেগাওয়াট থেকে নেমে ২৮০০ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে।

তার উন্নয়নের জোয়ারে খাদ্যশস্য উৎপাদন এক টনও অতিরিক্ত যুক্ত হয়নি। ১৯৯১ সালে তিনি ১৯০ লাখ টন উৎপাদন করতেন, ১৯৯৬-এ সেখান থেকে তিনি নড়াচড়া করেন নি। ২০০১ সালে শেখ হাসিনা ২৭০



www.pathagar.com

লাখ টন রেখে যান। খালেদা জিয়া এর সঙ্গে অতিরিক্ত যুক্ত করা তো দূরের কথা শুধু নিচেই নামছেন।

বিনিয়োগের হার আওয়ামী লীগ আমলে চার বছরে ২০ থেকে ২৩ শতাংশে পৌঁছে। খালেদা জিয়া চার বছরে ১ শতাংশও বাড়াতে পারেন নি।

তাঁর উন্নয়নের জোয়ারে শত শত নাগরিক বিনা বিচারে প্রাণ হারায় এবং পুলিশের হেফাজতে জনগণের নির্যাতন ও মৃত্যু হয়। তাঁর উন্নয়নের জোয়ারে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী মুফতি হান্নান রাষ্ট্রীয় ক্ষমা পাওয়ার জন্য তদ্বির করে। ঝিন্টু তো সুইডেন থেকে ২২ বছর পর এসে ১১ দিনে ফাঁসির দণ্ডাদেশ থেকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা লাভ করে।

তাঁর উন্নয়নের জোয়ারে রমনা বটমূল মামলায় ধরা পড়া মিজানুর রহমান শুধু মুক্তি পায় নি বরং পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর হয়েছে।

তাঁর উন্নয়নের জোয়ারে কৃষি খাতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি আওয়ামী লীগ আমলের (১৯৯৬-২০০১) ৪.৫ শতাংশের পরিবর্তে নেমে দাঁড়িয়েছে ১.৮ শতাংশ।

তাঁর উন্নয়নের জোয়ারে সরকারী বিনিয়োগ পূর্বতন পাঁচ বছরের তুলনায় জাতীয় আয়ের ৭ শতাংশ থেকে নেমে ৬ শতাংশে এসেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি, যোগাযোগ, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন ও জ্বালানি খাতেই সরকারী বিনিয়োগ বেশি হয়।

তাঁর উন্নয়নের জোয়ারে তাঁর প্রিয়পাত্র ও সহযোগীরা সবাই রাতারাতি ডজনখানেক টেলিভিশন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তাঁর উন্নয়নের জোয়ারে গ্রামে বিদ্যুৎ লাইন লাগানো হচ্ছে কিন্তু বিদ্যুৎ দেয়া হচ্ছে না। উদ্দেশ্য হলো কংক্রীট পিলারের মনোপলির মালিক খাস বান্দার সামান্য তরক্কী।

তাঁর উন্নয়নের জোয়ারে সব ধরনের ব্যবসা ও বেচাকেনা দুর্ধর্ষ সব সিন্ডিকেটের দখলে চলে গেছে। চাষী দু'টাকা পেলে সিন্ডিকেট সেখানে বিশ টাকা বানায়।

তাঁর উন্নয়নের জোয়ারে চাঁদাবাজি ও জোরপূর্বক আদায়ের হাত থেকে এমন কি চট্টগ্রামের বিএমপি নেতা ব্যবসায়ী জামালউদ্দিনও রক্ষা পায় নি। তবু তো তাঁর কঙ্কালটি পাওয়া গেছে।

খালেদা-নিজামী সরকারের উন্নয়ন হলো দেশকে লুটতরাজ, সন্ত্রাস, নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দেয়া। খালেদার সত্যিকার দেশ শত্রুতা হলো দেশের ভবিষ্যত ধ্বংস সাধন। শুধু বিদ্যুতের বিষয়টিই



www.pathagar.com

বিবেচনা করেন না কেন? সমস্যা হলো, খালেদা-নিজামী সরকার দেশের প্রগতির কোন স্বপ্ন দেখতে জানে না ও চায়ও না। তারা ভবিষ্যত নিয়ে পরিকল্পনা করে না করতেও চায় না। শুধু ক্ষমতায় থাকলেই হলো। লুটপাট ও নির্যাতন তো করা যাবে। তারা উন্নয়ন প্রকল্প চায় না, তারা চায় "থোক বরাদ্দ" লুটপাটের অনুবাদ। তবে তারা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে পারদর্শী। যে সব প্রকল্প-কারখানা, পুল, দালানকোঠা, রাস্তা, পূর্বতন ধারাবাহিকতায় সম্পন্ন হচ্ছে সেখানে অনুষ্ঠান করে উদ্বোধন ও ভাষণ প্রদান তাদের বিশেষত্ব। এমন কি যে প্রতিষ্ঠান তাদের জন্মের আগে গড়ে উঠেছে সেখানেও মেরামত বা পরিবর্ধনের নামে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেই যাচ্ছে। সরকারী খরচে ব্যক্তির প্রচারে এ এক নতুন কায়দা এই দুর্বৃত্ত সরকার প্রবর্তন করেছে।

আসল প্রশ্নটি হলো জঙ্গীবাদীরা বিরোধী শক্তিকে নির্মূলে লিপ্ত। তাদের আক্রমণ সব প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান বা দল। ভুলেও বিএনপি বা জামায়াত তাদের শিকার হয় না। জঙ্গীবাদীরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ওপর হানা দিয়েছে। ভবিষ্যতে বিশেষ করে নির্বাচনের প্রাক্কালে এই হামলা অব্যাহত থাকবে। জঙ্গীবাদীরা খালেদা সরকারের ব্যর্থতা অনেকাংশে মাটি চাপা দিয়েছে মূল্যমান সঙ্কট, ডলার পাচার সঙ্কট, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সঙ্কট– সবই সম্মুখ সারি থেকে সরে গেছে। উন্নয়ন নিয়ে মিথ্যাচার উন্মোচনে যে সময় যাবে তার মধ্যে খালেদা জিয়া কেল্লাফতেহ করতে বদ্ধপরিকর। তাঁকে ক্ষমতায় ফিরে আসতে হবে। নির্বাচনী সংস্কার কার্যক্রম থেকেও দৃষ্টি সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। জঙ্গীবাদ দমনই এখন সবাইকে নাচিয়ে রাখছে। সামান্য কোন পদক্ষেপ নিয়ে (যা বিচারপতি হাসান গররাজি হলে বা ধূর্ত আজিজ পদত্যগ করলে।) তিনি সদম্ভে নির্বাচনী নীলনকশা কার্যকর করতে পারবেন। তাঁর লুটপাট অব্যাহত থাকবে। দুষ্টলোকের মতে, টাকার অবমূল্যায়নের প্রধান কারণ বিদেশে সম্পদ পাচার।

মার্চ মাসে জাতির সঙ্গে ধোঁকাবাজি বড় বিপজ্জনক। ইয়াহিয়া–টিক্কা-মালিক এই ধোঁকাবাজি করে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিপতিত হয়েছে। মার্চের শুরুতে খালেদা-নিজামীর রাজাকার মনন জঙ্গীবাদ দমনে একটি পদক্ষেপ নিয়ে খুবই সফল হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির অনন্য দিবস ৭ মার্চ শুধুমাত্র একটি দলীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে যায়। সুপ্ত জাতি রহমান সন্ত্রাসী আর সিদ্দিক খুনীকে নিয়ে সব ভুলে যায়। তবে একটি জাতিকে বোকা প্রতিপন্ন করা বড় দুষ্কর। সন্ত্রাসী আর খুনীদের মদদদাতা ও



www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকদের রক্ষা করে জঙ্গীবাদ দমন হয় না। জঙ্গীবাদীরা এক সময়ে রক্ষকদেরও ভক্ষণ করে। আর বর্তমান বিশ্বে (বিশ্বায়নের কারণে) দেশশত্রু ও দেশ লুণ্ঠনকারীরা কোথাও আশ্রয় পায় না। ভুট্টো ভেবেছিলেন বিশ হাজার বাঙালী খুন করে আর সামরিক শক্তির মহড়া দিয়ে বাংলাদেশকে ঠাণ্ডা করা যাবে। ইয়াহিয়া এবং টিক্কা সংখ্যালঘু, যুব সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মেরে তাড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানী শান্তি স্থাপনে ব্রতী হন। নিরস্ত্র বাঙালি আবার কি প্রতিরোধ করবে? খালেদা জিয়াও সেই মানসিকতার শিকার। নিরস্ত্র বাঙালি একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ করে ইয়াহিয়াকে জবাব দিয়েছিল। বৈশ্বিক দাবা খেলায় বন্ধুহীন বাংলাদেশ জনমতকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। ইয়াহিয়া ও তার দোসর ৯৩ হাজার দস্যু নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে বেঁচে যায়। আর ৪০,০০০ গুহার জীব রাজাকার আলবদররা পালিয়ে ও আত্মগোপন করে ও জেলে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যায়। বর্তমানের দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী আত্মসমর্পণ করবে না গুহার আশ্রয় নিয়ে পালাবার ফন্দি করবে? যে "জয় বাংলা"র ডাকে পাকিস্তানের ভিত্তি চুরমার হয়ে যায় মার্চ এই সেই "জয় বাংলা" মাস। নিজামী একবার পালিয়ে গিয়ে ক্ষমা পেয়ে রক্ষা পেয়েছেন। এবারে এই দেশশত্রু জঙ্গীবাদী নেতাদের নিস্তার নেই।

*স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ২০০৬, জনকণ্ঠ*



www.pathagar.com

# বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা

আগস্ট মাসটি দুটি প্রজন্মের জন্য একান্তই শোকের মাস। ১৯৭৫ সালের পনেরো আগস্টে এর শুরু। একটি দেশদ্রোহী দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী সেদিন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী ছিল পাকিস্তানের দোসর ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল। যে মহান বিশ্ববরেণ্য নেতা সব সময় ভাবতেন ও মাঝে মাঝে বলতেনও বটে, বাংলাদেশে কোন বাঙালি তাকে মারতে যাবে না, তাঁরই শাহাদত হয় কতিপয় পথভ্রষ্ট ভাড়াটে সৈনিকের হাতে। স্বাভাবিকভাবে এ জন্য গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলে এবং তাতে সহায়তা করে রাজনীতিবিদ, সেনাপতি এবং আমলা গোষ্ঠীর কিয়দংশ। সেদিন থেকে এই মাসটি হয় বাঙালির শোকের মাস। বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাড়ে তিন বছরের মাথায় ঘটে যায় একটি মারাত্মক ও ঘৃণিত প্রতিবিপ্লব। এই প্রতিবিপ্লবের প্রভাব থেকে দেশ আজও মুক্ত হতে পারে নি এবং এই মুহূর্তে চলছে জাতির মজ্জাগত মূল্যবোধ উদ্ধারের সংগ্রাম এবং গোটা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম।

এই প্রতিবিপ্লবের অভিশাপ হিসেবে রাষ্ট্রীয় চরিত্র বদলের প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত। মানুষের ইহজাগতিক চেতনাকে কেন্দ্র করে যে জাতিটি গড়ে উঠেছে তাকে দুর্বৃত্তগোষ্ঠী পরাতে চাচ্ছে ধর্মরাষ্ট্রের খোলস এবং এই উদ্যোগে শুধু সুবিধাবাদীরাই লিপ্ত নয়, প্রধান ভূমিকায় আছে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রু জামায়াত, আলবদর ও আল শামস। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী শক্তির ছত্রছায়ায় এই দানব ডালপালা মেলে এখন দাপটে ক্ষমতার কলকাঠি কব্জা করে নিয়েছে। তারা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের বিধ্বংসী এবং অসভ্য কর্মকাণ্ড। শোকের মাসের গভীরতা এই দেশশত্রু গোষ্ঠী মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি করেছে গত সাড়ে চার বছরের দুঃশাসনের সুযোগে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্টে এই দেশশত্রুরা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতিভূ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক সমাজের পরিচয় চিহ্ন এবং উন্নয়ন



www.pathagar.com

ও সুশাসনের সার্থক প্রবক্তা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনাকে হত্যা করার ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। উপযুপরি গ্রেনেড হামলায় বিকালের পড়ন্ত বেলায় মহানগরের জনাকীর্ণ এলাকায় শহীদ হন ২৪ জন নেতাকর্মী এবং আহত হন শ'পাঁচেক নিরীহ মানুষ। তবে দুষ্কৃতকারীরা তাদের মূল লক্ষ্য হাসিলে হয় ব্যর্থ। বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও সহযোগীদের আঠারোজনকে হত্যা করেও দুর্বৃত্তগোষ্ঠীর রক্তপিপাসা নিবৃত্ত হয় নি। এবার তারা বঙ্গবন্ধু তনয়া ও তাঁর সহযোগীদের হত্যাস্ত্র হাতে নেয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্টে এই দুর্বৃত্ত দেশশত্রুদের আক্রমণ হয় আরও ব্যাপক, আরও বিধ্বংসী এবং আরও অর্থবহ। এবারে তাদের টার্গেট হয় আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমাজ সংগঠন। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র, একটি জেলা বাদে তেষট্টি জেলায় প্রায় পাঁচশ' এলাকায় হয় একই সময়ে ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণ। দেশশত্রুদের সাহস কত? তারা জানিয়ে দেয় যে সারাদেশ ধ্বংস করার ক্ষমতা তারা রাখে এবং তারা 'তাগুতি' শাসন উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠা করবে 'ইসলামী' শাসন।

তাছাড়া এই আগস্টের ২০০৪ সালে ৫ ও ৭ তারিখে সিলেটে হয় বোমা ও গ্রেনেড হামলা। প্রথমদিনের টার্গেট ছিল আধুনিকতার নিদর্শন তিনটি প্রেক্ষাগৃহ। আর দ্বিতীয় দিনের টার্গেট ছিল আওয়ামী লীগের মহানগর কার্যকরী পরিষদ। এই দ্বিতীয় আক্রমণে জীবন দেন মহানগর আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ইবরাহিম এবং কোনমতে রক্ষা পান মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি নগরপিতা মেয়র কামরান। ২০০৫ সালে এই আগস্টে ১৫ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি আহম্মদিয়া সম্প্রদায় হয় বোমা ও অগ্নিসংযোগের শিকার। আবার ১৬ তারিখ মুন্সীগঞ্জে হিন্দুদের একটি মনসা মেলায় হয় বোমা আক্রমণ।

পঁচাত্তরে পনেরো আগস্টের পর জাতির যে ক্ষতি হয়েছে তারই একটি চিত্রের সামান্য পরিচয় আমরা দেখছি। দুঃশাসনে দেশটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের কাতারে পৌঁছে যাচ্ছে। দুর্নীতিতে বছরের পর বছর আমরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে চলেছি। ১১ সেপ্টেম্বরের (২০০১) পর পৃথিবীর কোথাও সন্ত্রাসের এমন বিকাশ সম্ভব হয় নি। এত বোমা হামলা গ্রেনেড হামলা বা অগ্নিসংযোগের ঘটনা আর কোন দেশে এতটি হয় নি। সন্ত্রাসীদের হাতে এত মৃত্যু অন্য কোথাও হয় নি। এই সন্ত্রাসের বিশেষত্ব হল যে, এই সন্ত্রাসের টার্গেট মাত্র একটি গোষ্ঠী বা আদর্শ। শুধু আওয়ামী লীগ এবং



www.pathagar.com

প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে। ভুলেও এর কোন শিকার আমাদের সরকার বা জোট সদস্য বা তাদের কোন প্রতিষ্ঠান হয় নি। এই বিবেচনায় সহজেই বলা চলে যে, বর্তমান দুর্দশার বা সঙ্কটের আসল কারণ একত্রিশ বছর আগের বর্বর হত্যাকাণ্ড এবং সামরিক বাহিনীর একাংশের দেশদ্রোহিতা ও হঠকারিতা। দুঃখের বিষয়, এই দেশদ্রোহিতা ও হঠকারিতার বিচার আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল জোট সরকারের চক্রান্তের ফলে।

কিন্তু এই বাংলাদেশ তো আমাদের বাংলাদেশ নয়। এই বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হতে পারে না। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার প্রথম মোলাকাত ১৯৪৭ সালের জুন মাসে সিলেটের বখতিয়ার বিবি বালিকা বিদ্যালয়ে। তবে পরিচয় হয় সম্ভবত ১৯৫৩ সালে আমি যখন সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র। ১৯৫৬ সালে আমার চাকরি জীবনের শুরু হয় সেই সময় তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রী থাকাকালে কুমিল্লায় তাঁর সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর সুযোগ হয়। ১৯৬১-৬৩ সময়কালে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো ফুটবল খেলার মাঠে। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকারে যোগদানের পর মুহূর্তের জন্য মোলাকাত হয় সময়ে সময়ে। ১৯৬৬ সালের মে মাসে পাকিস্তান সরকার তাঁকে প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে এবং কারাবাসে থাকাকালেই ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করে। এই মামলা জনতার রুদ্ররোষে খারিজ হয় ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। ২৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাস্তবেই জেলখানা থেকে রাষ্ট্রীয় অতিথিখানায় হাজির হলেন দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের লক্ষ্যে আইয়ুব খানের আহূত গোল টেবিল বৈঠকে। গোল টেবিলের প্রথম বৈঠক একদিনেই স্থগিত হল ঈদ পালনের জন্য। দ্বিতীয় অধিবেশন চলল ১০ থেকে ১৪ মার্চ। ওই একদিন আর পরবর্তী পাঁচদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সময় কাটানোর সর্বশেষ সুযোগ আমি পাই। তাঁর দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম আমি। তাঁর সঙ্গে পরবর্তী মোলাকাত হয় স্বাধীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ১৯৭২ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি। এই মহামানবের অধীনে নানা বিষয়ে কাজ করার সুযোগ হয় পরবর্তী সোয়া তিনটি বছর। আমার নির্ধারিত সরকারি দায়িত্বের গণ্ডীর বাইরে নানা বিষয়ে কাজের সুযোগ তিনি আমাকে প্রদান করেন। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় ১৯৭৫ সালের মার্চের শেষ সপ্তাহে। বঙ্গবন্ধু শুধু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ছিলেন না।



www.pathagar.com

এই ভূখণ্ডের ইতিহাসে তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। আমাদের উপমহাদেশ সভ্যতার একটি প্রসূতি কেন্দ্র। সভ্যতার এখানে বিকাশ হয় উত্তর পশ্চিমে আমরি, কালীবাগান ও কোটজিপি– বতসি এলাকায় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ২৩০০ অব্দে। একই সময়ে ছোট ছোট সভ্য বসতি গড়ে ওঠে কাশ্মীর উপত্যকায়, আসাম পাহাড়ে, মহিশূর ও মধ্যভারতে। পরবর্তী সময়ে আমরা পাই সিন্ধু উপত্যকার হরপ্পা সভ্যতা ও গঙ্গা উপত্যকার গাঙেয় সভ্যতা। প্রায় হাজার বছর পর এদেশে আগমন হয় মধ্য এশিয়া বা আনাতোলিয়া থেকে আর্যজাতির। বাংলাদেশ ছিল গাঙ্গেয় সভ্যতার পূর্ব প্রান্ত বিশেষ। পুন্ড্রবর্ধন ও ওয়ারি বটেশ্বরে গাঙ্গেয় সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে। উপ মহাদেশের তথ্যনির্ভর ইতিহাসের সূচনা হয় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। তখন থেকে আমরা দেখতে পাই ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট বসতি বা রাজ্যের একত্রীকরণ যাতে প্রথম হাজার বছরে বিশেষ অবদান রাখেন শ্রীগুপ্ত, রাজা শশাঙ্ক ও রাজা গোপাল। অতঃপর দেখি বাংলা ভাষার বিকাশ– যেখানে পুঁথি ও কাব্যসাহিত্য আধুনিক যুগে একটি সমৃদ্ধ ভাষার জন্ম দেয়। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই ক্রমবিকাশের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরষ্কার পেয়ে বাংলাকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণে অবদান রাখে পাল, সেন, ইলিয়াস শাহী, হোসেন শাহী, মোগল, কোম্পানি রাজ এবং ব্রিটিশ রাজত্ব। চিন্তার জগতে বিবর্তন নিয়ে আসেন অতীশ দীপঙ্কর, হযরত শাহজালাল, শ্রীচৈতন্য, রাজা রামমোহন রায়, ডি রোজারিও, হাজী শরীয়তুল্লাহ, স্যার সলিমুল্লাহ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ। এসব মহান জাতি ও রাষ্ট্র স্রষ্টার মেলায় আমরা পাই এক বিরাট মহীরূহ, বাঙালির অতি আপনজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। অনন্তকাল ধরে যে বাঙালি জাতি গড়ে উঠছিল তাকে জাতিসত্তা প্রদান করেন এই মহান নেতা। বাংলাদেশের তিনি স্থপতি ও জনক। এই বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর ছিল সব চিন্তাভাবনা, কর্মোদ্যম এবং স্বপ্ন। তার জীবনের পরম সত্য ছিল 'আমি আমার দেশকে ভালোবাসি। আমার দেশ আমাকে ভালোবাসে।'

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশের চিত্রটি হবে একান্তই মোটা দাগে। স্বপ্নের বাংলাদেশের প্রথম চরিত্র হল এইটি একটি যৌগিক জাতির দেশ। এইটি কোন সংশ্লেষী সত্তা নয়। এখানে নানা ধর্ম, নানা বর্ণ, নানা বিশ্বাস নিজস্ব



www.pathagar.com

স্বকীয়তার ক্ষেত্রটি ঠিক রেখে, এক দেহে হয়েছে লীন। সাম্প্রদায়িকতার এই দেশে জায়গা নেই। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি এই দেশে চলে না। ধর্মের নামে নির্যাতন–দলনও এখানে অচল। বাংলাদেশের সংবিধানে এরকম সমাজের নিশ্চয়তা তিনি প্রদান করেন।

* তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্ন ছিল দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র চালু হবে। সেজন্য ইউনিয়নে, থানায়, জেলায় হবে জনগণের নির্বাচিত সরকার। প্রথম স্বাধীনতা দিবসে মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে জেলায় জেলায় সরকারের ঘোষণা তিনি দেন। জেলায় গভর্নর নিয়োগের ব্যবস্থারও লক্ষ্য ছিল স্বশাসিত জেলা কাউন্সিল।

* তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নিঁখাদ সার্বভৌমত্ব। ভারতের সেনাবাহিনীকে তিন মাসের মধ্যে তিনি প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেন। বাণিজ্যে কারও ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীলতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা ছিল তাঁর নিরলস। চীন স্বাকৃতি দেয়ার আগেই সে দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যবস্থা তিনি করেন।

* তিনি চেয়েছিলেন যে, দেশের সব সন্তান এক ধারায় মৌলিক শিক্ষা আহরণ করবে। সেজন্য সংবিধানেই যথোপযুক্ত দিকনির্দেশনা ছিল এবং প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য তিনি সমুদয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সরকারে ন্যস্ত করেন। উচ্চ শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও স্বাধীনতার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করেন।

* তিনি বলতেন বাংলাদেশ হল এশিয়ার সুইজারল্যান্ড। সুইজারল্যান্ডের প্রাচীন ঐতিহ্য নিরপেক্ষতা ও উন্মুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা তাঁকে আকর্ষণ করে। বাংলাদেশকে তিনি জোট নিরপেক্ষ সংস্থায় নিয়ে যান। বাংলাদেশকে একটি ট্রানজিট স্থলভূমি এবং বাংলাদেশের নদীতে অবাধ নৌচলাচলের তিনি ব্যবস্থা নিতে ব্রতী হন।

* বাংলাদেশের নদী নিয়ে ছিল তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ। তিনি বুঝতেন যে বাংলাদেশের সীমিত ভূখণ্ড বিশাল গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা অববাহিকার সব পানি নিষ্কাশন করে। তাই প্রধান নদীপথগুলোকে সর্বদা নাব্য রাখা ছিল তাঁর স্বপ্ন। ড্রেজিং নিয়ে তাঁর চিন্তাধারা ও জারিজুরি অনেক সময় প্রকৌশলীদের কাছে হয়ে যায় অসহনীয়। নদী, সেচ, পুল, বাঁধের যে কোন প্রকল্পে তার প্রথম প্রশ্ন থাকত, নদীশাসন ও ড্রেজিং।



www.pathagar.com

* ছাত্রাবস্থায়ই বঞ্চিত ও নিপীড়িতদের নিয়ে ছিল তাঁর যত মাথাব্যথা। ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবি নিয়ে আন্দোলনে তিনি শুধু জেলই খাটেন নি, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িতও হন। স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার নির্দেশনা ছিল, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সরকারি বেতনের অনুপাত দশের চেয়ে বেশি হবে না। তাঁর সময়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ছিল কৃষিখাতে, যেখানে দেশের পাঁচ ভাগের চার ভাগের কর্মসংস্থান হতো।

* একটি সংহত অর্থনীতিকে তিনি উন্নয়নের পূর্বশর্ত মনে করতেন। এখন আমরা বিশ্বায়নের কথা বলি। তখন লক্ষ্য ছিল অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ সংহতি বৃদ্ধি, যাতে উৎপাদনের প্রতিটি উপাদান সহজে সারাদেশে বাজার খুঁজতে পারে। গ্রামীণ পূর্তকর্ম তাই তাঁর এজেন্ডায় ছিল সর্বাগ্রে। দেশে যখন যুদ্ধের ক্ষতি পুনর্নির্মাণের আয়োজন চলছে তখন জাপানি মিশনের কাছে তাঁর দাবি হল, অতিসত্বর যমুনা সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। বাস্তবে তিনি যখন প্রথম জাপান সফরে গেলেন ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে তখনই এই সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

* একটি স্বল্পোন্নত, জনবহুল দরিদ্র দেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার ছিল তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। প্রথম সুযোগেই তিনি জাতিসংঘ পরিবারের সদস্য হতে জোর দেন। কমনওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ সংস্থা, ইসলামী রাষ্ট্র সংস্থা সর্বত্র তিনি সদম্ভে পদচারণা করতেন। যখন সাহায্য সংস্থা গ্রুপ প্রতিষ্ঠার কথা উঠল সেই ১৯৭৪ সালে তখন তাঁর দাবি ছিল যে, এই গ্রুপে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সবার প্রতিনিধিত্ব থাকবে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো এবং পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশগুলোকে তিনি সচরাচর যে পশ্চিমী দেশের গ্রুপ হয় তাতে সম্পৃক্ত করতে জোর তদ্বির চালান। খুব সফল না হলেও অন্তত তেল উৎপাদনকারী দেশ এই গ্রুপে প্রথমবারের মতো সদস্য হয়। এ ব্যাপারে আমি নিজেই তাঁর হুকুমে কতিপয় দেশে বিশ্বব্যাংকের আমন্ত্রণপত্রের পক্ষে তদ্বির করতে যাই।

* দেশের সম্পদ জাঁকজমকে ব্যয় করা মোটেই তাঁর সইতো না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হল যে ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে যখন তিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশ ও বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করতে যান তখন তাঁর সফরসঙ্গীদের অত্যন্ত সাদামাটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ওয়াশিংটনেও ব্যবস্থা ছিল এই রকম, সেখানে অনেক সফরসঙ্গী বন্ধুবর্গের



www.pathagar.com

বাড়িতেও অবস্থান করেন। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে আমি একজন অতিথিকে নিয়ে ঢাকায় আসি। অতিথি তাঁরই প্রতিষ্ঠানের খরচে ভ্রমণ করছেন। তিনি চট্টগ্রামে যাবেন, তাই হেলিকপ্টর চাই। প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টরের জন্য অনুমতি দিতে আপত্তি করেন। আমি তাঁর কাছ থেকে জানলাম যে, ওই রুশ হেলিকপ্টরে তেল খরচ ছিল খুব বেশি, তাই তিনি এটির ব্যবহার খুব কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করতেন। একইভাবে মন্ত্রীদের বিদেশ ভ্রমণও তিনি শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতেন। আর সে যুগে অফিস-আদালতের বেশভূষা বা সুযোগ-সুবিধা সবই ছিল দেশের দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

* বঙ্গবন্ধু ১৯৫৮ সালে আমেরিকা এক সরকারি সফরে যান। মার্কিন সরকার উন্নয়নশীল দেশের নেতাদের তাদের দেশটি পরিভ্রমণে নিয়ে যেত এবং তারা সেখানে নানা রাজ্য, নানা প্রতিষ্ঠান, নানা প্রশাসন, নানা প্রতিনিধি পরিষদ, নানা বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে বেড়াতেন। বঙ্গবন্ধু এক সময় লস এঞ্জলেস শহরে গেলেন এবং তিনি উঠলেন এমবেসেডর হোটেলে। প্রসিদ্ধ এই হোটেলে ১৯৬৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রবার্ট কেনেডি আততায়ীর হাতে নিহত হন। এই হোটেলে একজন বাঙালি ছিলেন হিসাবরক্ষক। তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করেন এবং তার নামও মুজিবুর রহমান হওয়ায় তাঁর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গতা জমে ওঠে। তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মাঝে মাঝে বাজারে ঘুরতেন। বঙ্গবন্ধু কোনখানে থামলেই বলতেন, 'মিতা, আমার দেশে কবে এমনটি হবে বলেন তো?' কনজ্যুমার-সোসাইটি না হোক হেসেখেলে দু'চারটে খেয়ে কাপড় পরে বাংলার মানুষ জীবনযাপন করতে পারবে। বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্ন এখনও অপূর্ণ রয়েছে। সেজন্য যে জনহিতে নিবেদিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সে পথ থেকে তো আমরা অনেক দূরে। লুটপাট আর দুঃশাসন দুর্নীতি ও অপশাসন হচ্ছে এই দুর্ভাগা দেশের বর্তমান পরিচয়।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নির্মাণের সুযোগ পান মাত্র সাড়ে তিন বছর। কিন্তু এই অল্প সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে দিকনির্দেশনা তিনি রেখে যান তারই যৎসামান্য এখানে বিবৃত হল। বাংলাদেশ নানা ঝড়ঝাপটার মধ্যে সৃষ্টি হয়। তখন মানবাধিকার, যুদ্ধাপরাধী, রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতা– এসব বিষয় সমকালীন চিন্তাধারা ও বিধি নিষেধ সবই ছিল বাংলাদেশের বিপক্ষে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু



www.pathagar.com

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির রূপরেখা বানিয়ে যান সেইটিই কিন্তু আজও আমাদের জন্য সঠিক পথ। মাঝেমধ্যে দলের স্বার্থে (দেশের নয়) আমরা নতজানু নীতি গ্রহণ করি কিন্তু প্রতিবারেই অবশেষে, আমাদের মৌলিক পথেই ফিরে যেতে হয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক, মানবাধিকারের জন্য উচ্চস্বর, বঞ্চিতের জন্য বলিষ্ঠ উদ্যোগ, অর্থনৈতিক সম্পর্কে রাজনীতিকে পেছনে রাখা এবং যে কোন ক্ষেত্রে শান্তির সপক্ষে অবস্থান এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ– এসব মৌলিক নীতি বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করে যান।

এখন আমাদের সামনে একটিই পথ উন্মুক্ত। আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে উদ্ধারের জন্য আমাদের বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন অবলম্বন করতে হবে। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

*১৫ আগস্ট ২০০৬, যুগান্তর*



www.pathagar.com

# অন্ধকারে দুষ্ট চক্র পরাজিত হবেই

এবারের বিজয়ের মাসে আমাদের জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ নিদারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। এ বিজয়ের মাসে আমার সামনে আছে দুটি রাস্তা। বর্তমান বাস্তবতার তোয়াক্কা না করে আমি সহজেই বিজয়কালের অর্থাৎ ১৯৭১ সালের স্মৃতিতে নিমগ্ন হতে পারি এবং এ স্মৃতি দিনদিনই মধুর থেকে মধুরতর হচ্ছে। বাস্তবতা এত নিষ্ঠুর এবং এত কদর্য যে, পুরনো দিনের দুঃখ-দুশ্চিন্তা এতে ম্লান হয়ে যায়।

একাত্তরের সারাটি সময় আমি মার্কিন দেশে ছিলাম এবং মুক্তিযুদ্ধ আমার জন্য শুরু হয়ে যায় সত্তরের ডিসেম্বরের ১২ তারিখ। সেদিনের ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের ৫ লাখ লোক নিখোঁজ হয়ে যায়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাতে মোটেই বিচলিত ছিল না। নিউইয়র্কের পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা ডিসেম্বরেই তাদের বিচ্ছেদের অঙ্গীকার ঘোষণা করে। তাদের সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখে ইষ্ট পাকিস্তান লীগ এবং মার্চে আরও পরিবর্তন করে এ সংগঠন হয় বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা।

২৫ মার্চের ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ সূচিত হলে ২৯ মার্চে আমেরিকার সমুদয় বাঙালি ওয়াশিংটনে ক্যাপিটল হিলের সিঁড়িতে বাংলাদেশের পক্ষে তাদের শপথ ঘোষণা করেন। সেদিন বিকালে ৫০০৬ এজমুর লেনের আমার বাড়িতে আমি পাকিস্তানের গোর রচনা করি। বিজয়ের মাসের আগেই ২২ নভেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন 'আত্মরক্ষামূলক হামলা' সমর্থনের নীতি গ্রহণ করল তখনই আমরা অনেকেই প্রচণ্ডভাবে আশাবাদী হয়ে উঠি। ৩ ডিসেম্বর জেনারেল ইয়াহিয়া পশ্চিম ভারতে তার 'ঝটিকা' বিমান অভিযান' শুরু করলেই মনে হয় যে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি হানাদারদের পলায়নের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের বিজয়ের পূর্বমুহূর্তে তাদের বিদ্বেষমূলক ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাপর্ব যে কত ব্যাপক হতে পারে তা নিয়ে ছিল গভীর দুশ্চিন্তা।

বিজয় সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত থাকলেও ধ্বংসলীলা ও হত্যাযজ্ঞ নিয়ে ছিলাম দারুণ শংকিত। তাই ৩৬ বছর আগে বিজয়ের মাসে আশা ও আশংকার অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলাম দোদুল্যমান। এবারেও পরিস্থিতি প্রায়


www.pathagar.com

একই রকম। সেবার ৪ ডিসেম্বর থেকে জাতিসংঘে শুরু হয় এক দূরভিসন্ধিমূলক নাটক এবং তাতে আশংকা আরও বর্ধিত হয়, অথচ জাতিসংঘ তো ছিল শান্তির প্রতীক ও প্রবক্তা। যুদ্ধবিরতির তিনটি উদ্যোগই ছিল বাংলাদেশের বিপক্ষে। নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রতিটি প্রস্তাবেই ছিল পাকিস্তানের জন্য আশার বার্তা আর বাংলাদেশের জন্য মৃত্যুর ঢংকা। আমাদের সৌভাগ্য যে, সোভিয়েত রাশিয়ার তিনটি ভেটো ইয়াহিয়া ও নিক্সন-কিসিঞ্জারের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়। মাঠে বিজয় সম্পন্ন করে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

কাকতালীয়ভাবে ১৪ ডিসেম্বর ছিল আমাদের আশংকার একটি বিশেষ দিন। সে রাতে সংসদ সদস্য কোরমানের বাড়ি থেকে ফেরার পথে শুধু ভাবছিলাম যে, ঢাকায় যখন যাব তখন এক ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ দেখতে পাব। জেনারেল মানেকশ'র আত্মসমর্পণের আহ্বানে জেনারেল নিয়াজীর নিশ্চুপতাই এই আশংকার জন্ম দেয়। বিধ্বস্ত ও বিধ্বংষ ঢাকার কথা ভেবে শিহরিত হয়ে উঠি। তবে ওই দিনে এই ধ্বংষাকার না হলেও মর্মান্তিক, এক হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। আলশামস আর আলবদরের বেজন্মারা সেই দিনই নৃশংসভাবে হত্যা করে আমাদের পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের এক অমূল্য গোষ্ঠীকে। বর্তমান সংকটেও এসব বেজন্মাদের অবদান রয়েছে। তাদেরই উত্তরসুরিরা আজ দেশটাকে অন্ধকারে নিমজ্জনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ১৪ ডিসেম্বরের উদ্বেগ ও আশংকা ইতিহাসের বিবেচনায় বস্তুতই ছিল যথার্থ। আজও সেই উদ্বেগ ও আশংকা বিরাজমান।

এবারের বিজয়ের মাসে সারাদেশে রয়েছে একাত্তরের প্রায় সমতুল্য অস্থিরতা ও সংঘাতের আশংকা। রাজাকার জোটের পাঁচ বছরের দুঃশাসন দেশটাক যে অবস্থানে নিয়ে গেছে এবং পচনের যে ধারা চালিয়ে গেছে তাতে স্বস্তির কোন অবকাশ নেই। দেশের সর্বশেষ আশ্রয় সর্বোচ্চ আদালতকে এ অশুভ শক্তি যেভাবে কলুষিত করেছে তাতে আশার স্থল আর থাকছে না। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মোদাচ্ছির হোসেন এবং এর্টনি জেনারেল মোহাম্মদ আলী নেপথ্যের ইঙ্গিতে যে নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন তাতে প্রশ্ন জাগে যে, এই দুর্বৃত্তপনার জন্যই কি এ দেশটির বীরসন্তান ৩০ লাখ লোক শহীদ হল?

আমাদের বর্তমান সংকটটি হচ্ছে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও নিরপেক্ষ সরকারের কারণে দলীয় রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন একটি অসাংবিধানিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন। নির্দলীয় প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বে তিনি দলীয় চক্রান্তে লিপ্ত। একটি দুর্বৃত্ত নির্বাচন কমিশন ভোটাধিকার হরণ করেছে, অবাধ ভোটের ক্ষেত্র ধ্বংস করেছে এবং নিতান্ত বেহায়ার মতো



www.pathagar.com

ক্ষমতা ধরে আছে। খালেদা-নিজামী সারাদেশে দলীয় এক প্রশাসনযন্ত্র রেখে গেছে, যারা আজও তাদের সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, গণরোষ থেকে রক্ষা করছে এবং তাদের জন্য জালিয়াতির ভোটের পক্ষে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। জনতার দাবি হল সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের জন্য সমতল ক্ষেত্র। যেখানে সহিংসতারও আশংকা রয়েছে কারণ খালেদা-বাবরের জঙ্গিবাদীরা ঊর্ধ্বতন নেতদের ছাড়াও বহাল তবিয়তে সাময়িক স্বস্তিতে আছে। এক কথায় নির্বাচনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে একটি অন্যায় প্রেক্ষাপটে। এ পরিপ্রেক্ষিত এমন যে, আমরা রাষ্ট্রপতিকে মহামান্য বলতে পারছি না। তিনি বাস্তবেই 'রাষ্ট্রপতিশাসিত' স্বৈরাচারী সরকার চালাচ্ছেন। প্রধান বিচারপতিকে স্বীকার করতে পারছি না কারণ তিনি অবৈধ আদেশ দিয়েছেন এবং মেরুদণ্ডহীনতার পরিচয় দিয়েছে। আর নির্বাচন কমিশন তো বিএনপি দুর্বৃত্তদের একটি আখড়াবিশেষ। প্রশাসনে আছে দলবাজ কতিপয় সুবিধাবাদী।

এ সময়ে দারুণভাবে আছাড় খেয়েছি আমাদের জাতীয় গৌরব শান্তির জন্য নোবলজয়ী অধ্যাপক ইউনুসের বক্তব্যে। তিনি শান্তির জন্য সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছেন এবং একটি প্রস্তাবও দিয়েছেন। তিনি আমাদের উচ্ছ্বাস ও উল্লাসকে এক উচ্চমার্গে উন্নীত করেন। কিন্তু তিনিই আবার পতনের রাস্তায় আমাদের বিসর্জন দিয়েছেন। শান্তির জন্য চাই গণতন্ত্র। শান্তির জন্য চাই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অধ্যাপক ইউনুস ন্যায়ের যে হাহাকার দেশে বিরাজ করছে তা বোধহয় বুঝে উঠতে পারছেন না। ডেইলি স্টারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বক্তৃতায়, নাগরিক উদ্যোগের উদ্ভাবনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় আর সর্বশেষ ঢাকা সিটির নাগরিক সংবর্ধনায় বক্তৃতায় তিনি ন্যায়ের বিষয়টি যেন মোটেই আমলে নিলেন না। ন্যায় বাদ দিয়ে শান্তি চাইলে তো একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ করতে হতো না? গণতন্ত্রের জন্যই তো ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু না হলে তো গণতন্ত্রই লুট হয়ে যাবে। গণতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে ন্যায়কে পরিহার করে, কি পথে আমরা শান্তি খুঁজব?

বিজয়ের মাসে একদিকে স্মরণ করি মধুর স্মৃতি ও উদ্দীপ্ত অভিজ্ঞতা– অনিশ্চয়তা, আশংকা ও উদ্বেগ থাকলেও অগ্রগতি থেমে যায় নি। অন্যদিকে দেখছি দুরূহ সংকট– অমানিশা ও অন্ধকারের রথযাত্রা। কিন্তু মনেপ্রাণে জানি, বিজয় আমাদের হবেই। অমনিশার নিশাচররা আর অন্ধকারের দুষ্টচক্র পরাজিত হবেই। জয় বাংলা।

*৫ ডিসেম্বর ২০০৬, যুগান্তর*



www.pathagar.com

# একুশের শিক্ষা ও বর্তমান বাস্তবতা

ফেব্রুয়ারি আমাদের শোকের মাস, উৎসবের মাস, গৌরবের মাস এবং আত্মানুসন্ধানের মাস। ফ্রেব্রুয়ারিতে কৈশোর আমাকে পিছু টানে। আবার ফেব্রুয়ারির সঙ্গে সঙ্গে মার্চও যেন যুক্ত হয়ে যায়।

একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ২০০০ সালে ইউনেস্কো এই ঘোষণাটি প্রদান করে। ১৯৫২ সালে এই দিনটি হয়ে ওঠে শহীদ দিবস। বাংলা ভাষাকে দেশের রাষ্ট্রভাষার অধিকার দিতে শহীদ হন আমাদের ভাইয়েরা। কতজন যে শহীদ হয়েছিলেন একুশে আর বাইশে ফেব্রুয়ারিতে তার সঠিক হিসাব নেই। আমরা পাঁচজনের নাম সচরাচর বলে থাকি– বরকত, জব্বার, রফিক, সালাম ও শফিক। সম্ভবত শুধু বরকত আর রফিক ছিলেন ছাত্র। তবে আমার ডায়েরিতে দেখতে পাই যে কানাঘুষা ছিল, পুলিশ লাশ গুম করেছে তাই শহীদ সংখ্যা হয়তো সাত থেকে বারো জন ছিল। সচরাচর ভাষার দাবিতে এরকম শাহাদতবরণ ছিল অপরিচিত। মধ্যযুগে ইউরোপে লাটিনের অত্যাচারে অন্য ভাষা নিষ্পেষিত হয়। এখন যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা আদিবাসীদের ভাষাকে অবহেলা করে সেরকম। তবে বাংলা অদ্ভুত ভাষা বটে এবং এই ভাষাভাষী জনগণ যেখানেই থাকুক না কেন তাদের ভাষাগত প্রাণ। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপনকালে ১৯ মে আসামের বরাক উপত্যকায় এগারোজন আবার ভাষার দাবিতে শহীদ হন। বাংলাদেশে ভাষার দাবিতে ১৯৫২ সালে পর শাহাদত আর হয় নি। তবে আন্দোলনকারীদের নির্যাতন অনবরতই চলতে থাকে বছরের পর বছর।

আমি একুশে ফেব্রুয়ারির কথা ভাবলেই ১৯৪৮-এ ফিরে যাই। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি সবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে। তার আগে থেকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি সামনে চলে আসে। আমাদের সিলেটে বাংলার দাবিতে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ আলোচনা সভা করল ৯ নভেম্বর। ঢাকায় এরকম সভার জন্য ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। পাকিস্তানের শুরুটাই ছিল অন্যায় ও বৈষম্যকে আশ্রয় করে। ৬৩ শতাংশ লোক বাংলা ভাষাভাষী অথচ সরকারি ফরম, ডাকটিকিট, নোট



www.pathagar.com

এসবে বাংলা স্থান পেল না। গণপরিষদের ভাষা হল ইংরাজি ও উর্দু। বাংলার দাবি মানাই হল না। প্রতিক্রিয়াও হল তাই ব্যাপক। সিলেটে ১৯৪৮-এর ৮ মার্চ হল দাঙ্গা, উর্দু সমর্থকরা বাংলার পক্ষের সভা পণ্ড করে দিল। ঢাকায় ও অন্যত্র ১১ মার্চে ছাত্র–পুলিশ হল মুখোমুখি অবস্থানে। তবে আমাদের রাজনৈতিক চরিত্র তখনও তত খারাপ হয় নি। তাই রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে হল ছাত্র নেতৃত্বের সংলাপ ও সমঝোতা। কিন্তু সমঝোতা টিকল না আর পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পানি আরও ঘোলাটে করে দিলেন। ঊনপঞ্চাশ, পঞ্চাশ ও একান্নতে ১১ মার্চ ছিল রাষ্ট্রভাষা দিবস। আমাদের নিজেদের সরকার তখন হয়ে গেল গণশত্রু আর ঔপনিবেশিক ধারায় হল দলন-পীড়নে আরও উগ্রপন্থী। সেই ধারা এখনও চলছে।

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দাবি উপেক্ষা করা, প্রতিবাদকারীদের নির্যাতন করা এবং বিক্ষোভ হলেই দেশদ্রোহিতার গন্ধ পাওয়া তখন থেকেই হয়ে যায় আমাদের সরকারি চরিত্র। আমরা অন্যায় আইন জারি করতে শুরু করি। অহেতুক নির্যাতনের আশ্রয় নেই এবং জনগণের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকি। একই সঙ্গে ধর্মের দোহাই দিয়ে জাতীয় জীবনে স্থায়ী বিভাজনের বন্দোবস্ত করতে থাকি। চরিত্রের এই অবক্ষয়ের প্রতিবাদ ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি। অন্যায় ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল ছাত্র সমাজ। পুলিশের লাঠিপেটা, গুলিবর্ষণ আর গ্রেফতারের শিকার হল ছাত্র–জনতা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে খাড়া হয়ে গেল সর্বাত্মক অসহযোগ। একুশ থেকে সাতাশ পর্যন্ত জনজীবন ছিল বিপর্যস্ত, অফিস– আদালত ছিল বন্ধ, জনরোষ ছিল গগনচুম্বি। পুলিশ শুরুতে প্রচারের যন্ত্র মাইক্রোফোন বাজেয়াপ্ত করল, শহীদ মিনার গুঁড়িয়ে দিল, হল ভাংচুর করল, ও ছাত্র–শিক্ষক ছাত্রাবাসে গ্রেফতার করল। পরদিন হল বন্ধ করে ছাত্রদের বিতাড়ন করল। সাত মার্চের মধ্যে আন্দোলনকে তারা থামিয়ে দিল, সব নেতাকে ধরে নিয়ে গেল।

কিন্তু ভাষার দাবি তো এগিয়েই চলল। একুশের প্রাথমিক শিক্ষা ছিল নিম্নোক্ত–

অন্যায় আইন মানা যায় না। ১৪৪ ধারায় সভা, শোভাযাত্রা, সমাবেশ নিষিদ্ধ হল না। লাঠির আঘাত, কাঁদানে গ্যাসের হামলা, রাইফেলের বুলেটও সেই আইনকে বহাল করতে পারল না। অন্যায় আইনের ব্যর্থতার দায়ভার আইন অমান্যকারীর নয়, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগকারীর।

পুলিশ নির্যাতন, সরকারি সন্ত্রাস ও দলন-পীড়নের প্রতিষেধক হল জনগণের সুদৃঢ় ঐক্য। লক্ষ্য যেখানে সুস্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত, ঐক্য সেখানে



www.pathagar.com

অটুট। ধর্ম নিয়ে হুজুগের সৃষ্টি, আদর্শ নিয়ে বাদানুবাদ এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এমন ঐক্যে ভাঙন ধরাতে পারে না।

একুশ মানেই মাথা নত না করা। ১৯৫৩ সালে ঢাকা কলেজে শাহ মোয়াজ্জেম আর ইনাম আহমদ চৌধুরী প্রমুখ কলেজে থেকে বহিষ্কৃত হলেন কিন্তু ভয় পেলেন না। কয়েক মাস পর তাঁরা সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করলেন। ১৯৫৫ সালে কিশোর শামসুল আরেফিন আর আনোয়ার আনসারী প্রমুখ মাস ধরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কষ্ট করল। কিন্তু দাসখৎ সই করল না। সসম্মানে তারা মুক্তি পেল। একুশের আর এক নাম সৎসাহস ও দৃঢ়তা।

একুশ ছিল একান্তই গণতন্ত্রের আদর্শ মহিমান্বিত। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয় আর মুসলিম লীগ সরকারের ভূমিধসের পেছনে ছিল একুশের স্ফুলিঙ্গ। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই এলো বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার ঘোষণা এবং ১৯৫৫ সালেরও ৩০ ডিসেম্বর এ বিষয়ে সংবিধানে ছিল আসল সমাধান। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ বাংলা ভাষা হল পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। সংবিধানে এই সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত হয়।

একুশ আমাদের আত্মপরিচয় ও আত্মশ্লাঘার দুয়ার খুলে দেয়। আমরা বুঝলাম যে সপ্তম খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা ভাষাকে ঘিরে একটি যৌগিক জাতিসত্তা গড়ে উঠছে। ভাষার এই বন্ধন রাষ্ট্র, ধর্ম ও গোষ্ঠীর সীমানা ভেদ করে সার্বজনীন। দেড় হাজার বছরের ঘাত-প্রতিঘাতে সাজানো জাতিসত্তা অবশেষে আত্মপ্রকাশ করল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝখানে কবি আবদুল হাকিম যে খেদ প্রকাশ করেন একুশে তা ধুয়ে-মুছে লীন হয়ে যায়। আমাদের সর্ববর্ণের ও সর্বধর্মের যৌগিক জাতিসত্তা আমরা খুঁজে পেলাম এবং তারই অপরিহার্য বিবর্তনে ১৯৭১-এ আমরা প্রতিষ্ঠা করলাম স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ছত্রিশ বছরে এবার আমরা পড়েছি একটি দারুণ সংকটে। গণতন্ত্র আমাদের দেশে কাজ করছে না। যে ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা পায় সেই ভোটকে গায়েব করে ফেলেছে এক জোট নিযুক্ত নির্বাচন কমিশন। রাজনৈতিক দলে যারা দেশের শাসনে অপরিহার্য তারা হয়ে গেছে মাস্তানি ও কালো টাকায় কলুষিত। সরকারি মদদে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, জবরদখল আর চাঁদাবাজি। সরকারই সৃষ্টি করে আইনহীনতা ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে সারাদেশ এবং ক্ষমতাধরদের সুপ্ত বাসনাকে করেছে জাগ্রত। এই অবস্থায় রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাত পরিহারে দেশে জারি হয়েছে জরুরি অবস্থা। জরুরি অবস্থা কখনও দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে না। এটি একান্তই জরুরি বা সাময়িক ব্যবস্থা। জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে



www.pathagar.com

সরকারকে জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ভোটার তালিকা উদ্ধার করতে হবে। নির্বাচন কমিশন থেকে অদক্ষতা ও দুর্নীতি উৎপাটন করতে হবে। ভোট প্রদান প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ও অবাধ করতে হবে।

এই প্রধান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সন্ত্রাস, দলীয়করণ ও দুর্নীতিকে বশে আনতে হবে। দেশটি যে দুর্বিষহ অবস্থানে নিপতিত হয়েছে তা শুধু রাজনীতিবিদের দোষে হয় নি। সেখানে আমলাতন্ত্র, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো, ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সবাই সমভাবে দুর্নীতি ও দুর্বত্তপনায় জড়িয়ে পড়েছিল। সন্ত্রাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, স্বজনপ্রীতির প্রধান প্রবক্তা, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুযোগ সন্ধানে সবচেয়ে প্রত্যুৎপন্নমতি জামায়াত এদেশের একটি অভিশাপ বিশেষ। দেশের সর্বোচ্চ সময়ের জন্য ক্ষমতাসীন বিএনপির লোভ–লালসা ও দুঃশাসনকে অবহেলা করা যাবে না। বিগত পাঁচ বছরে তারা ধরাকে সরাজ্ঞান করেছে, সারাদেশে গড়ে তুলছে সন্ত্রাসী গডফাদার, অসংখ্য ভূমিদস্যু, জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারী তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা, উৎকোচ ও কমিশন গ্রহণকারী অগণিত নেতা, আমলা ও ব্যবসায়ী। এরশাদ আমলের আট বছরের দুর্নীতির কাহিনী ও জাতীয় পার্টির লুণ্ঠন সেখানে ম্লান হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের শাসনামলেও এই দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের প্রশমন হয় সামান্য। দেশটি তবুও এগিয়ে যাচ্ছিল। বিগত পাঁচ বছরে তাও হচ্ছে না। বিদ্যুৎ নেই, সার নেই, রাস্তাঘাট হচ্ছে না এবং সর্বোপরি বিচার নেই।

এই সমুদয় প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে। সবাইকে সব দলকে এবং সব গোষ্ঠীকে এক মানদণ্ডে বিচার করতে হবে। সুতরাং সেখানে ভারসাম্য বজায় রাখা সমীচীন হবে না। আইনের শাসন ও আইনের কাছে সবার সমতার আদর্শ দেশ থেকে অপহৃত হয়েছে। সেই আদর্শ পুনরুদ্ধার না করলে চিরস্থায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আমি পাকিস্তান আমলে দু'বার রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ করেছি। প্রতিবার দাবি করে গ্রেফতারি পরোয়ানা পরীক্ষা করেছি। জেলে মোটামুটিভাবে সদ্ব্যবহার পেয়েছি। এখন এসবের বালাই নেই। গ্রেফতারি পরোয়ানা না থাকলে ধৃত ব্যক্তিকে গুম করা যায়। ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধের শিকার করা যায়। রিমান্ডে তৃতীয় মাত্রা কমবেশি ছিল কিন্তু এমন ভয়াবহ তৃতীয় মাত্রা– কোহিনুর থেরাপি এসব ছিল না।

বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ না হলেও সচরাচর ৫৪ ধারায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে এক মাসে ছেড়ে দেয়া হতো। কাউকে গ্রেফতার করলে তার উর্ধ্বতন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজনকে খবর দেয়া হতো। এসবই



www.pathagar.com

সভ্য ব্যবহারের নিদর্শন এবং আইনের শাসনের ভিত্তি। এসব সুসভ্য ট্র্যাডিশন আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বাংলাদেশে দুর্নীতি কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিষয় নয়। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় অবশ্যই তার বিস্তার ঘটে ব্যাপক ও বিপুল। কিন্তু সব ক্ষমতাধর গোষ্ঠী মায় গ্যাস মিটার রিডার বা ট্রাফিক পুলিশও দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্তির সুযোগ নিয়ে তাদের নির্যাতন করা ও তাদেরও রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন এরাও করেন। একজনকে ছেড়ে অন্যজনকে পাকড়াও করলে দুর্নীতি সমস্যার সুরাহা হবে না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদও দেশে মাঝে মাঝে ঘোষিত হয়েছে এবং দুর্নীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিও পেয়েছে। এখানেও মূল বিষয় হল নৈতিক অবকাঠামো এবং দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ করা। দুর্নীতির সাক্ষ্যপ্রমাণ সামাজিক আন্দোলন ছাড়া কোনমতেই পাওয়া যাবে না। দুর্নীতির নানা রাস্তা বন্ধ করার সুযোগ রয়েছে বিস্তর। সেগুলো বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। আমার যেন মনে হয় উৎকোচ গ্রহণের চেয়ে বড় দুর্নীতি এখন হল চাঁদাবাজি, ভূমি দখল, সরকারি খরচে নিজের ঘরবাড়ি, খামার বাগান বা শিল্পের উন্নয়ন। এসবের প্রতিকার মোটেই দুঃসাধ্য নয়।

একুশের সবচেয়ে বড় শিক্ষাটিই যেন বর্তমানে আমরা উপেক্ষা করে যাচ্ছি। একুশের বিষয়টিতে ছাত্ররাই প্রথমে সোচ্চার হয়। এতে প্রশাসনিক সংকট সৃষ্টি হয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর নির্যাতন সর্বমোট আটটি বছর (১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫) বহাল থাকে। এর অর্থনৈতিক নিহিতার্থও ছিল। এতে সামাজিক অধিকারের বিষয়ও ছিল। কিন্তু আন্দোলন ও তার সমাধান মূলত ছিল রাজনৈতিক। এর দেশব্যাপী বিকাশ হয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে। রাজনীতির ওপর এ বিষয়ের প্রভাব ছিল বিনিশ্চায়ক। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মূল চালিকাশক্তি ছিল রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি। বর্তমানে জরুরি অবস্থায় রাজনৈতিকে অপাঙ্‌ক্তেয়করণের এক অশুভ প্রয়াস চলছে। দুষ্ট রাজনীতিকে শায়েস্তা করার নামে রাজনীতিকে বিসর্জনের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক। আমাদের সংকট সমাধানের রাস্তা স্পার্টার রাস্তা নয়, রাস্তাটি হল এথেন্সের। আমাদের দেশটি কোন সামরিক বা প্রশাসনিক দেশ হতে পারবে না। ইতিহাস বলে এই দেশে গণতন্ত্র সহসা বিকশিত হয় না, এজন্য অনুশীলনের প্রয়োজন এবং আদর্শ নেতৃত্বের প্রয়োজন। এ দেশে গণতন্ত্র পদে পদে বাধা পেয়েছে এবং এজন্য আমাদের বর্তমান দুরবস্থা। নতুন করে কোন বাধা, কোন হোঁচট আমাদের কাম্য নয়।

রাজনীতি যতই বাধাগ্রস্ত হোক, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যতই রুগ্ন হোক একটি দেশকে সমুন্নত রাখতে তার বিকল্প কিছুই নেই। আমাদের রাজনীতি



www.pathagar.com

বিসর্জন দিলে সমূহ বিপদ। বরং রাজনীতির আধুনিকায়ন ও ক্রমবিকাশ আমাদের জন্য খুবই জরুরি। জরুরি অবস্থার সুযোগ এবং ভবিষ্যতে এই অবস্থা পরিহারের জন্য প্রধান কাজটি হল রাজনীতির আধুনিকায়ন। আর এই কাজটি আইন করে, হুকুম করে বা চাপিয়ে দিলে চলে না। দু'দুটি দল বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি এদেশে সামরিক ছত্রছায়ায় গঠিত হয়েছে কিন্তু তাতে তো প্রগতি তেমন হয় নি। জরুরি অবস্থার আচ্ছাদনে আরও দল গঠনের পরিণতি সেরকম হবে না বলে কী গ্যারান্টি আছে। আমাদের ভাবতে হবে ক্ষমতার প্রতিসংক্রমন, যাতে করে তৃণমূল থেকে নেতৃত্ব বিকশিত হতে পারে। আমাদের প্রয়োজন দলের নেতৃত্ব বিকাশে নির্বাচনের ওপর মহানির্ভরশীলতা। আমাদের দেশে আশ্চর্য ঘটনা হল, কোন দলের প্রাথমিক সদস্য মোটেই নেই। সদস্যরা সব এডহক। নিয়মিত কাউন্সিল সদস্যরা হন এডহক। কাউন্সিলে নির্বাচন হয় অস্বচ্ছ ও এডহক। এই এডহকের রাজত্ব থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

খুব জোরেশোরে বলা হচ্ছে যে, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন হলে নানা সমস্যার সমাধান হবে। না, তা মোটেই হবে না। নিবন্ধনটি কেন? একটি সুষ্ঠ নীতিমালা, সহনশীল আচরণ, স্বচ্ছ অর্থায়ন গণতান্ত্রিক নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়া– এসব বিষয়ে শৃংখলা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই নিবন্ধন। আমরা কি আমাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও অপরিণামদর্শিতায় এমন অবস্থায় পড়ি নি যে এখন আমাদের নিজেদেরই এ থেকে উত্তরণের রাস্তা বের করতে হবে? আমার মনে হয়, একটি রাজনৈতিক আচরণবিধি প্রণয়নে আমরা যথাযথ দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি না। সুধী মহলও এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করছেন না। একুশ আমাদের রাজনীতিকে এক সুউচ্চ মার্গে পৌঁছে দেয়। এবারের সংকটে একুশের সেই অর্জনের দিকে আমাদের নজর দেয়া দরকার। দেশে যারা বর্তমানে ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন– তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সেনা সদর এবং নির্বাচন কমিশন– তাদের এ বিষয়ে শুধু অবহিত নয়, সচেতন হতে হবে। রাজনৈতিক সংলাপ ছাড়া আমাদের মুক্তির পথ নেই। দলগুলোর মধ্যে যোগাযোগ এবং দল এবং ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের মধ্যে আলোচনা ও যোগাযোগ ছাড়া আমরা মোটেই এগুতে পারব না। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাই আমাদের একুশের আদর্শ ও একুশের দীক্ষায় আবার উদ্দীপ্ত হতে হবে।

একুশের আদর্শ সমুন্নত হোক।

একুশের শিক্ষা বিকশিত হোক।

*১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, যুগান্তর*



www.pathagar.com

# মার্চের অসহযোগ আন্দোলন

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭১ সালে মার্চ মাসের প্রথম পঁচিশ দিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আওয়ামী লীগ সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। সর্বস্তরের জনগণের এমন স্বতঃস্ফূর্ত ও অনাবিল সমর্থন এই আন্দোলন লাভ করে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার সমুদয় দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই নিতে হয়। সরকারি কাঠামো ভেঙে পড়ায় শুরুতে বেশ বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং এক ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বেধে যায়। আশ্চর্যজনকভাবে একজন নেতার আহ্বানে সারাদেশ শান্তিরক্ষা ও শৃংখলার এক নজিরবিহীন উদাহরণ স্থাপন করে। আওয়ামী লীগের প্রতিদিনের ঘোষণা জনগণকে তাদের রাস্তা বাতলে দেয় এবং তারা সব বিধিনিষেধ বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়। ক্ষমতার উৎস সত্যিকারভাবে হয় জনগণের ইচ্ছা ও সমর্থন। স্বশাসনের এই অভিজ্ঞতা ছিল অভূতপূর্ব। এই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালে তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের মঙ্গলে ক্ষমতার এই প্রয়োগকে বিঘ্নিত হতে দিতে তারা চায় নি। তাই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যখনই বন্দুকের জোরে ক্ষমতা প্রয়োগে লিপ্ত হল, তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই পঁচিশ দিনের আর একটি দিক ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে সম্মানজনক ভাবে সহাবস্থানের জন্য বাংলাদেশের শেষ প্রচেষ্টা। গণতান্ত্রিক উপায়ে, আইনের বিধানে ও ন্যায়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে একটি সাংবিধানিক সমঝোতায় আসতে চায়। নির্বোধ ইয়াহিয়া এবং ধুরন্ধর ভুট্টো কোন মতেই তা হতে দিল না। আর সেনাবাহিনীর ষড়যন্ত্র, ভিত্তিহীন আত্মশ্লাঘা এবং সেনানায়কদের ক্ষমতার লোভ নয় মাসের জন্য বাংলাদেশে এক ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। জনতার রুদ্ররোষে দস্যুদলের হয় উৎখাত এবং গর্বিত ও সুশৃংখল পাকিস্তান সেনাবাহিনী 'শর্তহীন আত্মসমর্পণে' বাধ্য হয় এবং দুই বছরের বেশি সময় যুদ্ধবন্দি হিসেবে থাকে। পঁচিশ দিনের স্বশাসনের অভিজ্ঞতা, পঁচিশ দিনের গণঐক্য এবং এই



www.pathagar.com

পঁচিশ দিনের আত্মবিশ্বাস না থাকলে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়তোবা প্রশ্নবোধক হতে পারত।

এই আন্দোলন দেশ ও জাতিকে দেয় সংগ্রামের মানসিকতা এবং ত্যাগ স্বীকারে বাঙালিদের প্রস্তুত করে। একই সঙ্গে লক্ষ্যের স্বচ্ছতা এবং অঙ্গীকারের দৃঢ়তা শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করে। আন্দোলনটি ছিল সার্বজনীন ও স্বতঃস্ফূর্ত। তার ফলে রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীরা রাষ্ট্র পরিচালনার আস্বাদ পায়। বঙ্গবন্ধুর মহান নেতৃত্ব ক্ষমতা প্রয়োগে সংযম ও সহনশীলতার আদর্শ সমুন্নত করে। বস্তুতপক্ষে মার্চ মাসের প্রথম পঁচিশ দিনেই মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী কর্মসূচি, ধারা ও গতি নির্ধারিত হয়ে যায়। পহেলা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরণ ছিল একটি অশনি সংকেত। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থ বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন দেবে না। ভুট্টো ও সামরিক জান্তার ষড়যন্ত্রের যেন বহিঃপ্রকাশ হল এই অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষদের অধিবেশন বানচাল করে দেয়া। যে হারে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য সমাহার ঘটছিল, তাতে এবার আর সন্দেহ রইল না। প্রদেশপাল অ্যাডমিরাল আহসান ক্ষমতাধরদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠায় ভালো অবদান রাখেন। তাকে যখন বরখাস্ত করা হল তখন জনগণ ইয়াহিয়া জান্তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শুধু সন্দিহান নয়, বরং দারুণভাবে রুষ্ট হল। আইউবের পতন আন্দোলন থেকে যে বিরুদ্ধবাদিতা বাংলাদেশে দানা বাঁধছিল এখন তা আর বাধা-বিপত্তি মানতে রাজি ছিল না। ইয়াহিয়া-ভুট্টো ষড়যন্ত্রের সমুচিত জবাব ছিল তাদের উদ্যোগকে অগ্রাহ্য করা। ১৯৭০ সালে যখন প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু হল, তারপর অবাধ নির্বাচন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয় এবং ধাপে ধাপে পরিষদ অধিবেশনের দিক অগ্রগতি বাঙালিদের দেয় গভীর আত্মবিশ্বাস। নিজেদের দাবির যৌক্তিকতাও তাদের এই আত্মবিশ্বাসে অবদান রাখে। তাই ইয়াহিয়ার ঘোষণা যখনই প্রচারিত হল তখন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে ঢাকা হয়ে ওঠে মুখর। পহেলা মার্চে স্টেডিয়ামে একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা ছিল, ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে খেলাটিকেও বাতিল করে দিতে হল। সারাশহর নয় সারাদেশ হঠাৎ প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। মিছিল, স্লোগান আর বিক্ষোভ হল জনতার প্রতিবাদের প্রকাশ। নগরগুলোতে গণজমায়েতের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ হল, সামরিক বাহিনী মাঠে নামল, আবার কারফিউ জারি হল। কিন্তু ২ মার্চেই সারাদেশ হয়ে গেল বন্ধ। ৩ মার্চে জনগণের নেতা বঙ্গবন্ধু দাবি করলেন, সেনাবাহিনীকে ছাউনিতে ফিরিয়ে দিতে হবে, তারা নিরস্ত্র



www.pathagar.com

জনগণকে হত্যা ও নিষ্পেষণ করতে পারবে না, সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে এবং জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। সুষ্ঠুভাবে পরিষদে বসে, গণতান্ত্রিক কায়দায় সংবিধান রচনা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের নীলনকশা ইয়াহিয়া জান্তা বানচাল করে দেয়ায় এছাড়া তার অন্য কোনরকম দাবি করার সুযোগ ছিল না।

গণতান্ত্রিক ধারায় বিশ্বাসী এবং নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদে অভ্যস্ত বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশেরই একটি অবদান। রাজনৈতিক প্রতিবাদের একটি অতি উত্তম পদ্ধতি। এই আন্দোলনের রূপকার ছিলেন মহাত্মা গান্ধী এবং এর সূচনা হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়, যখন তিনি সেখানে অবস্থান করতেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি এই আন্দোললনের একটি দার্শনিক ভিত্তি দাঁড় করান এবং আন্দোলনের প্রক্রিয়াকে বাস্তব রূপদান করেন। আমেরিকায় মার্টিন লুথার কিং আন্দোলনের এই রীতি গ্রহণ করেন এবং আফ্রোমার্কিনদের মৌলিক অধিকার আদায়ে অস্ত্রটি মোক্ষম অবদান রাখে। গান্ধীর প্রথম অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ছিল ১৯২০ সালে খেলাফত অবসান এবং জালিওয়ানালাবাগ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে। ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এলো। গৃহিণীরা ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য ব্যবহার ও খরিদ করা ছেড়ে দিলেন। ব্রিটিশ আদালতে আর মামলা রুজু হয় না। সবই অহিংস পদক্ষেপ। দাবি হল দুটো– খেলাফতকে বহাল রাখতে হবে এবং রাওলাট আইন বাতিল করতে হবে। দাবি না মানা পর্যন্ত চলবে অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২২ সালে এই আন্দোলনে ভাটা পড়ে, কিন্তু প্রতিবাদের একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে তা প্রতিষ্ঠা পায়। গান্ধী ১৯৩০ সালে আবার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। এবারে তার দাবি ছিল লবণ শুল্ক প্রত্যাহার এবং ভারতের জন্য ডোমিনিয়ন স্টেটাস এবং দাবির জন্য তিনি গোলটেবিল বৈঠক বয়কট করেন। আন্দোলন আংশিকভাবে সফল হয়। আরউইন-গান্ধী চুক্তির পরে গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। আন্দোলন আবার চলে, কিন্তু পুরোপুরি সার্থক হয় না। ১৯৪০ সালে গান্ধী আবার অসহযোগ আন্দোলন ডাকেন। এবারে দাবি ছিল যে, ভারতীয়রা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ না দিতে পারে এবং অন্যকে এই যুদ্ধে সাহায্য করতে মানা করতে পারে। প্রথম শুরু হয় ব্যক্তির সত্যাগ্রহ, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিরা ব্রিটিশ সরকারের কারাবরণ করে। পরে ব্যক্তির সত্যাগ্রহ দলের সত্যাগ্রহে পরিণত হয়। দলে



www.pathagar.com

দলে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা কারাবরণ করেন। ১৯৪১ সালের ,মাঝামাঝি প্রায় বিশ হাজার লোক গ্রেফতার হন এবং চৌদ্দ হাজার কারাবাসে ছিলেন। ১৯৪২ সালে এই আন্দোলনই ভারত ছাড়ো (Quit India) নামে খ্যাতি লাভ করে। ক্রমে সহিংসতা যুক্ত হলে আন্দোলন ব্যর্থ হয়। মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস ও তার সহযোগী সরকারের বিরুদ্ধে আসাম, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দাবি আদায়ের জন্য।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম কথা হল, একটি দাবিনামা ঘোষণা। নির্দিষ্ট দাবিই হল আন্দোলনের লক্ষ্য। আন্দোলন মোটামুটি শুরু হয় ধর্মঘট ও মিছিল করে। সরকারি দফতরে ধর্মঘট, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতষ্ঠানে হরতাল বা যানবাহন হরতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, আদালত বর্জন, সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য। যেমন সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা বা কারফিউ ভাঙা। আরও কঠোর পদক্ষেপ হল, কর প্রদান বন্ধ। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল অহিংস পদ্ধতিতে সরকারকে অচল করে দেয়া এবং সমঝোতায় আসতে বাধ্য করা। তাই এই আন্দোলনকে বলা হয় সুশীল অবাধ্যতা। অসহযোগ আন্দোলন মোকাবিলা করারও একটি পদ্ধতি গড়ে ওঠে। প্রথমে বিক্ষোভ প্রদর্শন, সমাবেশ বা মিছিলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। বিধিনিষেধ ভাঙলে টিয়ার গ্যাস বা মৃদু লাঠি চালনা হয়। তবে প্রধান অস্ত্র হল গ্রেফতার; নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা নেয়া হয় এবং এতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু আন্দোলন তারপরও যদি চলতে থাকে তখন সরকার প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এবং সমাধান খুঁজে পেতে চেষ্টা করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলন এই অভিজ্ঞতার আলোকেই ঘোষিত ও পরিচালিত হয়। তাঁর আন্দোলন ছিল স্বেচ্ছাচারী সরকারের বিরুদ্ধে, বিনা কারণে বা অপর্যাপ্ত যুক্তিতে বিশ্বাস ভঙ্গের বিরুদ্ধে। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বক্তৃতায় তিনি সংকটের জন্য ইয়াহিয়াকে দায়ী করেন, ভুট্টোকে সুযোগ দেয়ার জন্য তার এই এক একতরফা ঘোষণা তিনি অগ্রাহ্য করেন। পহেলা মার্চের প্রতিক্রিয়া দেখে ইয়াহিয়া ৩ মার্চ এক নতুন ঘোষণা দিলেন। তিনি বারোজন নেতাকে ১০ মার্চ ঢাকায় এক সম্মেলনে ডাকলেন এবং জানালেন যে, এই সম্মেলন শেষে পক্ষকালের মধ্যে পরিষদ অধিবেশন ডাকা যেতে পারে। এই সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে ডাকলেন শুধু দু'জনকে– বঙ্গবন্ধু এবং নুরুল আমিনকে। উপজাতীয় এলাকা থেকে ডাকলেন শুধু দু'জনকে, এরা অবশ্য তারই মনোনয়নে নেতা হন।



www.pathagar.com

পরিষদ ডিঙিয়ে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সম্মেলন আহ্বানটি ছিল খুবই সন্দেহজনক, মনে হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিতবাহী। অধিবেশন শুরু করেই এরকম আলোচনা সভা করা যেত। বঙ্গবন্ধু এই উদ্যোগকে একটি নিষ্ঠুর রসিকতা বলে নাকচ করে দেন। তিনি তার তিনটি দাবি ঘোষণা শুরু অসহযোগ আন্দোলন করে করলেন। তিনি দেশব্যাপী পূর্ণ হরতাল ডাকলেন। তবে জনজীবন যাতে বিপন্ন না হয় সে জন্য হাসপাতাল, এম্বুলেন্স, সংবাদ মাধ্যম, ঔষধালয়, পানি সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ হরতালের আওতাবহির্ভূত রাখলেন। সারাদেশ তার ডাকে সাড়া দিল। পরবর্তী দিনে আরও কিছু প্রতিষ্ঠানকে হরতালের আওতামুক্ত করতে হল। ব্যাংক, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, দমকল বাহিনী এবং বর্জ্য কর্তৃপক্ষকে কাজ অব্যাহত রাখতে নির্দেশ দেয়া হল। ৩ মার্চেই ভবিষ্যতের বিস্তৃত কর্মসূচির ধারণা দেয়া হয় এবং ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর চূড়ান্ত ঘোষণা দেবেন বলে জানান।

মার্চের এই পঁচিশ দিনের দিনপঞ্জি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অসহযোগ আন্দোলন কীভাবে ক্রমে ক্রমে একটি সমান্তরাল সরকার গড়ে তোলে। এতে আরও দেখা যাবে যে, সূচনাতে কিছু বিশৃংখলার পর বস্তুতপক্ষে ৭ মার্চ থেকেই দেশে শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, অসহযোগ আন্দোলন বজায় রেখেও জীবনযাত্রাকে স্বাভাবিক করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। প্রতিদিন নতুন নতুন নির্দেশাবলী দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখা এবং জনজীবন স্বাভাবিক রাখার ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয় ১৫ মার্চ।

*১ মার্চ ২০০৭, যুগান্তর*



www.pathagar.com

# মার্চ মাসে যেমন ভাবছি

অগ্নিঝরা মার্চ। রক্তক্ষয়ী মার্চ। উত্তাল মার্চ। আত্মপ্রত্যয়ের মার্চ। স্বশাসনের মার্চ। স্বাধীনতা ঘোষণার মার্চ। মুক্তিযুদ্ধের মার্চ। নানাভাবে মার্চ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে মহামূল্যবান।

একাত্তরের তেসরা মার্চ ছিল সংবিধান প্রণয়নের জন্য পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন। একটি অবাধ নির্বাচনে ৩১৩ সদস্যের পরিষদের বৈঠক বসবে ঢাকায়। পয়লা মার্চে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক এই অধিবেশনটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলেন। মার্চের জন্য প্রযোজ্য নানা বিশেষণের উদ্ভব হয় এই ঘোষণাটির জন্যই। দোসরা মার্চ থেকেই শুরু হয়ে গেল হরতাল, অবরোধ আর অসহযোগ। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী জনগণের প্রতিপক্ষ হয়ে নিল অবস্থান। সাত মার্চের "স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম"– এর ঘোষণা এলো গণতন্ত্র বানচাল করার ভুট্টো-ইয়াহিয়া ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। চক্রান্তের রাজনীতি ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বশাসনের দাবি নস্যাত করার জন্য ছিল জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের স্থগিতকরণ। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তাঁদের সংবিধান প্রণয়ন ও ক্ষমতাগ্রহণের দায়িত্ব প্রতিহত করার জন্য ছিল এই স্থগিতকরণ।

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু এই ষড়যন্ত্র রুখে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েই গেলেন। তিনি অসহযোগের ডাক দিলেন একদিকে, অন্যদিকে অর্থনীতি ও প্রশাসন চালিয়ে যাবার জন্য জারি করলেন একটি একটি করে ৩৫টি বিধিমালা। রাষ্ট্রীয় নিগ্রহ বল প্রয়োগকারী সংস্থাকেই ছাড়া নেতার নির্দেশে জনগণই আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সব দায়িত্ব গ্রহণ করল। ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়েও পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সহাবস্থানের জন্য সংলাপও শুরু করেন। ১৭ মার্চে ইয়াহিয়া ঢাকায় সংলাপে বসলেন অথচ ঐ দিনেই সকলের অগোচরে সেনাবাহিনীকে অপারেশন সার্চলাইটের জন্য প্রস্তুত হতে



www.pathagar.com

হুকুম দিলেন। অপারেশন সার্চ লাইট ছিল পশুশক্তি প্রয়োগ করে বাংলাদেশকে স্তব্ধ করে দেবার পরিকল্পনা। একে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পরিকল্পনাও বলা যায়।

সংলাপে সমঝোতার প্রহসন করে ২৫ মার্চ বিকেলে তার সমাপ্তি ঘোষণা না করেই জেনারেল ইয়াহিয়া মদে বুঁদ হয়ে গোপনে ঢাকা পরিত্যাগ করে পশ্চিমে চলে গেলেন। সংলাপের ফলাফল ঘোষণা হলো ট্যাংকের অভিযানে। সারা ঢাকাকে নৃশংসভাবে অবদমিত করে ১৮ ঘন্টা পরে করাচীর নিরাপদ অবস্থান থেকে কাপুরুষ ইয়াহিয়া জানালেন সংলাপ ব্যর্থ হয়েছে এবং তিনি গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের হুকুম দিয়েছেন সেনাবাহিনীকে। ছয় দফার স্বশাসনের এই ছিল পাকিস্তানী সমাধান।

কিন্তু বাদ সাধল বাংলাদেশের জনগণ, জাতির দামাল ছেলেরা। ঢাকা ঠাণ্ডা হয়ে গেল কিন্তু দেশের সর্বত্র বিশেষ করে জেলা সদরে প্রতিরোধ শক্তভাবে গড়ে উঠল। সেনাবাহিনী ও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর বাঙালি সদস্যের সিংহভাগ জনতার প্রতিরোধে শামিল হলো নিরস্ত্র এবং যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত জনতা। তবুও লাঠি, বর্শা আর গাদা বন্দুকের প্রতিরোধ দমনে সুসজ্জিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সময় গেল প্রায় মাসাধিককাল। চট্টগ্রামের পতন হলো ৬ এপ্রিলে কিন্তু ময়মনসিংহ গেল ২৩ এপ্রিলে। রংপুর ও নোয়াখালীর পতন হলো ২৬ এপ্রিল এবং সর্বশেষে রামগড়ের পতন হলো দোসরা মে'তে। ইতিমধ্যে ১১ এপ্রিলে মুক্তিযুদ্ধের মহাপরিচালক প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা দিলেন। একই সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের আটটি বিন্যাসেরও আদেশ দিলেন। (পরবর্তীতে মোট এগারোটি বিন্যাস বা সেক্টর গঠিত হয়।)

মাত্র নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধের জন্য একটি বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে। যেখানে মাত্র ১১ হাজার সৈনিক, সীমান্তরক্ষী এবং পুলিশ ছিল প্রতিরোধের প্রশিক্ষিত শক্তি, সেখানে দেশে এবং সীমান্তের ওপারে গণবাহিনী ও অন্যান্য স্থানীয় বাহিনী মিলে ছিল প্রায় দেড় লাখ যোদ্ধা। এছাড়াও প্রায় লক্ষাধিক গেরিলা যোদ্ধা দখলদার বাহিনী ও তাদের রাজাকার সহায়কদের নাস্তানাবুদ করে রাখে। বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা দস্যুবৃত্তি ও গণহত্যায় লিপ্ত একটি দুশ্চরিত্র দখলদার বাহিনীকে কোণঠাসা করে শুধু ছাউনিগুলোতে আবদ্ধ করে রাখে। প্রায় লাখ পাঁচেক রাজাকার ও বিহারী ছাড়া সারাদেশ এই দস্যু দলের কার্যকারিতা বানচাল করে দেয়। তাদের দক্ষতা ছিল গ্রাম উজাড়ে, গণহত্যায়, লুণ্ঠনে এবং ধর্ষণে। মুক্তিযুদ্ধের শক্তি ছিল জাতীয় ঐক্য–



www.pathagar.com

যেখানে ধর্ম, গোত্র, শ্রেণীর কোন ভেদাভেদ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের শক্তি ছিল সুস্পষ্ট লক্ষ্যের দৃঢ়তা– দখলদারদের বিতাড়ন করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের শক্তি ছিল গণতন্ত্রের প্রতি গভীর নিবেদন– সরকার চালাবে জনপ্রতিনিধি। মুক্তিযুদ্ধের শক্তি ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশা, সমাজে ন্যূনতম সমতা প্রতিষ্ঠা পাবে।

মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করতে মাসদুয়েক লেগে যায়। গেরিলা যোদ্ধাদের তৎপরতায়ও কিছু সময় লাগে। অস্ত্রশস্ত্রের পর্যাপ্ততা নিয়েও তাদের সমস্যা ছিল। কিন্তু লক্ষ্যের দৃঢ়তা এবং দেশাত্মবোধ অপ্রস্তুত মুক্তিবাহিনীকে দুর্দমনীয় করে তোলে। "মুক্তি"র ভয়ে দখলদার দস্যুকুল প্রমাদ গোনে। বিশ্বজনমত, নানা দেশে সংসদীয় সমর্থন, বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা এই সব মুক্তিযুদ্ধের আগুনকে জ্বালিয়ে রাখে। ভারতের আশ্রয়প্রাপ্ত এক কোটি শরণার্থীর জোয়ান সদস্যরা হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধের একটি চালিকা শক্তি, দামাল যোদ্ধাদের সংগ্রহ ক্ষেত্র। অবশেষে ভারতের বলিষ্ঠ সহায়তায় নবেম্বর মাসেই শুরু হয় দেশমুক্ত করার শেষ অধ্যায়। দখলদারদের মনোবল যখন শূন্যের কোঠায়, মুক্তিযোদ্ধাদের তখন দুর্দমনীয় সাহস ও দৃঢ়তা। ডিসেম্বরের শুরুতে বাধলো সম্মুখ সময়। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অসাধারণ কূটনৈতিক সমর্থন এবং ভারতের যুদ্ধকৌশল এনে দিল ষোলো ডিসেম্বরের সাফল্য। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, প্রশাসন ও সহায়কদের তিরান্নব্বই হাজার সদস্য নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করে। ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মহুতি, তিন লাখ মা-বোনের ইজ্জতহানি এবং চৌদ্দ হাজার ভারতীয় সেনার শাহাদত বা পঙ্গুত্ব প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা ঘোষণার ছত্রিশ বছরে পর্যালোচনায় বসলে হিসাব আর মেলে না। আমাদের গণতন্ত্র নিদারুণভাবে অনুদার। মানবাধিকার এখানে অনবরত লুণ্ঠিত। বিচারবহির্ভূত হত্যা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বেশুমার নির্যাতন, বিনা নোটিসে বা অকারণে গ্রেফতার এ দেশে নিত্তনৈমিত্তিক। ধর্ম, গোষ্ঠী ও শ্রেণীর ভেদাভেদ প্রকট। সাম্প্রদায়িকতা ও ক্ষমতাশালীর দাপট বিগত পাঁচ বছরে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। সীমাহীন লোভ ও অবিশ্বাস্য দুর্নীতি দেশসেবাকে বিতাড়িত করেছে। বিগত পাঁচ বছর ছিল জঙ্গীবাদ ও দুর্নীতির স্বর্ণযুগ। কিন্তু সম্পদ লুটের যে কলেবর প্রতিদিন উদঘাটিত হচ্ছে তা ছিল অকল্পনীয়। বিগত পনেরো বছরে অবশ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মানব উন্নয়নে অগ্রগতি নিয়ে আমরা কিছুটা গর্ব করতে পারি। কিন্তু



www.pathagar.com

বিগত পাঁচ বছরে একটি দুর্বৃত্ত সরকার সর্বত্র ধস নিয়ে এসেছে।

মানব উন্নয়ন সূচক ১৯৯৭-২০০১ সালে ৫৬ পয়েন্ট এগিয়ে যায়। ৪৪০ থেকে বেড়ে গিয়ে হয় ৫০৬, অথচ পরবর্তী চার বছরে সে ক্ষেত্রে প্রগতি হয় মাত্র ২৪ পয়েন্ট। ৫০৬ থেকে ৫৩০। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন সব খাতে ধস নেমেছে।

মৌলিক দেশজ উৎপাদনে নেমেছে ধস। বিএনপি চিরদিনই কৃষি ও জ্বালানি খাতের শত্রু। বিগত পাঁচ বছরে সেই শত্রুতা তারা বজায় রেখেছে। খাদ্যশস্য, চিনি, পাট, হিমায়িত জলজ খাদ্য- কোথাও প্রবৃদ্ধি নেই।

জ্বালানি হলো জনগণের কর্মশক্তির উৎস। অথচ এখানে ২০০১ সালে আমরা যত মেগাওয়াট উৎপাদন করতাম (৩৮০০) তা থেকে ২০০৬ সালের উৎপাদন হলো প্রায় হাজার মেগাওয়াট কম। জ্বালানির অভাব সারাটি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে দেয়।

রাসায়নিক সার ও পরিশোধিত পেট্রোল দ্রব্য উৎপাদনে আমরা মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পড়েছি। যে সব উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল বা বিবেচনায় ছিল, দুর্নীতিপরায়ণ সরকার সেগুলো সব বানচাল করে দেয়। এক সময় আমরা যা রফতানি করতাম এখন তা আমদানি করি।

শিল্পে প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে শুধু তিনটি খাত- কাপড় ও পোশাক, সিমেন্ট এবং ওষুধপত্র।

উৎপাদনে ধস, আমদানিতে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি, চাঁদাবাজিতে অসাধারণ দক্ষতা, আর সীমাহীন লোভ যাতে দুর্ধর্ষ সব সিন্ডিকেট মূল্য নির্ধারণ করে, পাঁচ বছর ধরে বহাল রাখে দ্রব্যমূল্যের অবারিত উর্ধগতি।

এতদসত্ত্বেও দেশ এগিয়েছে। কৃষক ও শ্রমিকের ঘাম ও উদ্ভাবকের বুদ্ধি আমাদের সম্মান রেখেছে। নিম্নমানের প্রবৃদ্ধির বৃত্তে আমরা আবদ্ধ নই। আমরা তলাহীন ঝুড়ির অপবাদ অনেক আগেই ঝেড়ে ফেলেছি। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে মাত্র চারটি।

দুর্নীতি সর্বগ্রাসী এবং বলা হয় যে প্রবৃদ্ধির তিন শতাংশ দুর্নীতি কেটে নেয়। ক্ষমতাবান একটি সীমিত গোষ্ঠী জাতীয় সম্পদ লুট করছে, কর দিচ্ছে না এবং বিদেশে সম্পদ পাচার করছে। রাজনীতিবাদ, সামরিক-বেসামরিক আমলা, ব্যবসায়ী, ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় সবাই এই দুর্নীতির মহোৎসবে লিপ্ত। ইমপিউনিটির একটি পরিবেশ এবং জোট সরকারের লোভী ও পচনশীল নেতৃত্ব যে ক্ষতিটি করেছে তা থেকে কি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে?



www.pathagar.com

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস স্তিমিত কিন্তু মোটেও বিদায় হয় নি। সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকরা বহাল তবিয়তে আছে। জঙ্গীবাদীদের পুনর্গঠনের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। গত পাঁচ বছরে অভিশংসন ও তদন্ত যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া গেছে বলে মনে হয় না। ইমপিউনিটির সার্বিক পরিবেশে পরিবর্তন অবশ্য খুব সহজ নয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে উৎখাত না করতে পারলে (হ্যাঁ উৎখাতই বটে।) জাতি হিসেবে আমাদের নিস্তার নেই।

মারাত্মক দলীয়করণ সরকারী যন্ত্রটিকে একবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। পুলিশ এবং বেসামরিক প্রশাসনের দলীয়করণ ছাড়াও হয়েছে সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয়– সুপ্রীমকোর্ট, নির্বাচন কমিশন, সরকারী কর্মকমিশন, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় সংসদ সচিবালয় ইত্যাদি। মেধার স্বীকৃতি কোথাও নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ে তো নয়ই। দক্ষতার দাম কোথাও নেই, প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার করতে জানে না আমাদের উন্নয়ন প্রশাসন এবং কর্মীরা। বিচার পাওয়া একেবারে দুঃসাধ্য। চাকরিতে নিযুক্তি নিয়ে আজ বিরাট বাণিজ্য।

এই সব প্রতিবন্ধকতার ফলে বিনিয়োগ স্থবির এবং বিনিয়োগের উৎপাদী ক্ষমতা কম। দুর্নীতি আর অদক্ষতায় সব অপচয় হয়ে গেলে বিনিয়োগ হবে কি করে? তদুপরি আমাদের উচ্চবিত্ত ও এলিট গোষ্ঠী বড় আড়ম্বরপ্রিয়। আমার প্রায়ই মনে হয় পৃথিবীর দরিদ্রতম এই দেশের সরকারী কর্মকাণ্ডে রয়েছে কি রকম আড়ম্বর ও ধুমধাম।

পাঁচটি বছর দুর্নীতি ও দুঃশাসনের কবলে থাকার পর দেশটিতে তিন মাসের জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নিল। কিন্তু তার গোড়াতেই হলো গলদ। একজন দলজ রাষ্ট্রপতি বে-আইনীভাবে শত আপত্তির মুখে সরকার প্রধান হয়ে গেলেন এবং তিনি পরিচালিত হলেন পূর্বতন দুর্বৃত্ত সরকারের ইঙ্গিতে। জনগণের অনেক বিজয় হলো, কিন্তু তাতে জনজীবন ও অর্থনীতি ধাক্কা খেল। হরতাল-অবরোধ তো চূড়ান্ত পর্যায়ের পদক্ষেপ কিন্তু দুর্বৃত্তের প্রতিবাদে তাই হলো প্রাথমিক অস্ত্র। প্রথমে একজন সাজানো প্রধান উপদেষ্টা বিদায় হলেন। দ্বিতীয়ত, একজন দুষ্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনার গেলেন। তৃতীয়ত, ভোটার তালিকা শুধরানোর উদ্যোগ হলো কিন্তু তা ফলপ্রসূ হলো না। দলবাজ প্রশাসন ও পুলিশের তেমন পরিবর্তন হলো না। দেশটি যেন অবধারিতভাবে সংঘাত ও অস্থিরতার দিকে ধাবিত হতে থাকল।



www.pathagar.com

অবশেষে ১১ জানুয়ারিতে স্বস্তি মিলল, দেশে জরুরী অবস্থা জারি হলো। দলবাজ উপদেষ্টা পদত্যাগ করলেন, ১২ জানুয়ারিতে শুরু হলো একটি বিশ্বাসযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা। ৫ ফেব্রুয়ারিতে একটি নতুন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠন শুরু হলো। ২৩ ফেব্রুয়ারিতে একইভাবে একটি আস্থাযোগ্য দুর্নীতি দমন কমিশন হলো। সৌভাগ্যবশত ১ মার্চে সুপ্রীমকোর্টেও পরিবর্তনের সুবাতাস বইল। দুর্গন্ধময় কর্মকমিশন ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও পরিবর্তন অপেক্ষায় রয়েছে।

দুর্নীতিগ্রস্ত রাঘববোয়ালরা এখন চিহ্নিত হচ্ছে এবং সংবাদ মাধ্যম সব অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয় দুর্নীতি কাহিনী উদ্‌ঘাটন করছে। লোভ এ রকম সীমাহীন আমাদের ইতিহাসে কখনও হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। হয়ত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃটিশ রাজত্বের শুরুতে এমনটি ছিল। বিগত সরকার কি করে আর কেন এমন বেপরোয়া হয়ে গেল? জনপ্রতিনিধিরা কি করে এমন দস্যুবৃত্তি, খুনখারাবি, লুটপাট, জবরদখল আর নিয়োগ বাণিজ্যে লিপ্ত হতে পারল? কিন্তু দুঃখের বিষয় হলে যে, দেশকে যখন উৎখাতে নিয়ে যাচ্ছিল কতিপয় ব্যক্তি, বিরোধী দল আর সংবাদ মাধ্যমের এক গোষ্ঠী ছাড়া কেউ এর প্রতিকারে এগিয়ে আসে নি। প্রশাসন, নিগ্রহ বল প্রয়োগকারী সংস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা নিরাপত্তার প্রহরীরা কেউই কোন প্রতিবাদ করেনি বরং অনেকেই এই অনাচারে অংশ নিয়েছে। কোন কোন ব্যতিক্রম বাদ দিলে রাঘববোয়ালদের গ্রেফতার ও বিচারে প্রস্তুতি জনশ্রুতির অনুকূলে হয়েছে বলে জনগণ মনে করছে। কিন্তু জনশ্রুতিতে চিহ্নিত আরও অনেক রাঘববোয়াল এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে বলে মনে হয়। চিন্তার বিষয় হলো, ৫৫ হাজার চুনোপুঁটি যারা ধরা পড়েছে সেখানে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যক্তিগত শত্রুতা বা ঝগড়া অথবা তদানীন্তন প্রশাসনের রুদ্ররোষের শিকার কেমন হয়েছে তা সাবধানে বিবেচনা করা উচিত।

আর একটি বিষয় হলো জঙ্গীবাদের দমন। সেখানে কেন জানি দক্ষতার নিদর্শন দুর্বল, সাড়ে পাঁচ শ' রুজু করা মামলার তদন্ত কেমন হচ্ছে। তাদের পৃষ্ঠপোষকদের কিভাবে খোঁজ হচ্ছে? গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতা কিভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে, কিভাবেই বা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও তাৎক্ষণিক তার ধ্বংসকরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে? শুধু তদন্ত ও অভিশংসনের দুর্বলতা নয়, তার পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার কি গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে? কেন এতদিনেও আমরা এজন্য জাতিসংঘ সন্ত্রাস দমন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিচ্ছি না? এ ক্ষেত্রে দু'টি গভীর সন্দেহেরও নিরসন


www.pathagar.com

চাই। জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা বিবেচনা করতে হবে। গডফাদারদের মোকাবেলা করতে হবে। সরকারী কোন সংস্থায় দুষ্ট গোষ্ঠী নিয়ে সন্দেহ নিরসন করতে হবে।

প্রশাসন ও পুলিশের দলীয়করণ সহজে দূর করা যাবে না। বিশেষ করে বিগত পাঁচ বছরে যে হারে পদ সৃষ্টি ও কর্মচারীদের নব সংগ্রহ নিযুক্তি তাতে বিশেষ করে পুলিশে শুদ্ধি অসম্ভব। তাই এ ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নিতে হবে। কিছু দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপই শুধু নেয়া যাবে। প্রশাসনকে ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা নিয়ে শ্বেতপত্র বানানো যাবে কিন্তু তত সহজে তা করা যাবে না। এই বিষয়ে বাস্তব সচেতনতা খুবই প্রয়োজনীয়।

নির্বাচন কমিশনে মনে হয় প্রচুর কাজে এগিয়েছে। আইনের সংস্কার, প্রক্রিয়ায় সংস্কার, কালচারের সংস্কার বড় বিষয়। ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও ভোটারকে যথাযথভাবে শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে তারা চিন্তাভাবনা করছেন। ভোট নেওয়টাও বিবেচনার বিষয়। স্বচ্ছ বাক্স পেতে কি লাগবে? ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় উত্তরণে কি রকম সময় ও প্রশিক্ষণ লাগবে? রাজনৈতিক দলের আধুনিকায়ন তো সব সময়ই জরুরী। শুধু নিবন্ধনে কাজ হবে না। একটি সর্বসম্মত আচরণবিধি দরকার। সর্বোপরি স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত অর্থায়নের বিষয়টি বিবেচনায় না নিলে নিবন্ধনে কোন কার্যকর অর্জন হবে না। মার্চ মাসে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে না যে জনমতই হলো সর্বোচ্চ শক্তি। সরকারকে তার কাছেই দায়বদ্ধ থাকতে হয়। দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার উপায় হলো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। প্লেটোর অভিভাবকরা অবশ্যই সবচেয়ে ভাল সরকার। কিন্তু মানব-চরিত্র যেমন তাতে সে রকম অভিভাবক অনন্তকালের জন্য পাওয়া যায় না। এরিস্টটল সেই যুগে ১৫৮টি সংবিধান পরীক্ষা করে দেখেন এবং তাতে মাত্র তিনটি সংবিধানই ছিল ভাল। এই তিনটিই ছিল কোন না কোন ধরনের গণতন্ত্র।

*২৮ মার্চ ২০০৭, জনকণ্ঠ*



www.pathagar.com

# বিজয়ের মাসের ভাবনা

বিজয়ের মাসে প্রতিবারই আশা–নিরাশার কথা বলতে ইচ্ছা করে। কখনও শুধু স্মৃতিচারণেই আনন্দ মিলে। প্রায়ই মনের ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ মিলে। নানা ব্যর্থতার জন্য নিজের মাথায় তুলে নিতে হয় সব অভিশাপ। কি চেয়েছিলাম আর কি পেলাম। কি করতে পারতাম আর কি করলাম। এবারের বিজয়ের মাসে চিন্তা-ভাবনার জানালাটি একটু যেন বেশি উন্মুক্ত আর পরিধিটি বেশি বিস্তৃত। ঠিক তখনই এলো লেখার অনুরোধ, ভাবনার দুয়ার হল লাগামছাড়া।

এবারের বিজয় মাসে ১৫ নভেম্বরের মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়কে ভুলে থাকা যায় না। এখনও দুর্গতদের অনেকেই খোলা আকাশের নিচে দিনযাপন করছেন। দুর্গত এলাকায় রুজি-রোজগারের উপায় এখনও সৃষ্টি হয় নি। সম্পদের এমন বিনাশ অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এত বেশি হয় নি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আমি দুর্গত জেলাগুলোর অন্যতম বাগেরহাটের মহকুমা হাকিম ছিলাম। হৃদয়ের টানে ক'দিন আগে বাগেরহাট ঘুরে এলাম। প্রথমদিকে দুর্যোগ মোকাবেলায় বা ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিতে নানা ব্যর্থতা থাকলেও এখন অবস্থা মোটামুটিভাবে আয়ত্তে এসেছে বলে মনে হল। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ত্রাণ কর্মকাণ্ড কেউ আটকে রাখতে পারে নি। সরকারি উদ্যোগেও শৃংখলা ও পরিকল্পনা এসেছে বলে মনে হয়। দেশ-বিদেশের সাহায্যের প্রশংসা করতেই হয়। এখন প্রয়োজন পুনর্বাসন ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা ও সময়সাপেক্ষ কার্যক্রম। বাসস্থানের উন্নততর পূনর্বাসন চাই। মিঠা পানি সরবরাহের নির্ভরযোগ্য সংস্কার চাই। ক্ষেত-খামার এবং মাছ চাষের জলাধারের পুনর্বাসন চাই। রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা চাই। বিধ্বস্ত অবকাঠামোর শুধু সংস্কার চলবে না, উন্নয়নও চাই। শিক্ষাঙ্গনে ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ধ্বংসটি সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে পুনর্বাসন ও উন্নয়ন একসঙ্গে চলতে হবে। সুন্দরবনের ক্ষতি ছাড়াও বনায়ন ও গাছ লাগানোর জন্য বিশাল প্রকল্প চাই। এসব বড় মাপের সব কাজে



www.pathagar.com

জনগণকে সম্পৃক্ত না করলে কোন কার্যক্রম সাফল্যের মুখ দেখবে না। সাঁইত্রিশ বছর আগে এই মাসে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। দখলদার দুর্বৃত্ত পাকিস্তান বাহিনী এই মাসেই পালানোর রাস্তা ধরে ১৬ ডিসেম্বরে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে। এই মাসে আমরা আবার মনে করি যে, পাকিস্তানকে ধ্বংস করে পাকিস্তানেরই দুর্বৃত্ত সেনাবাহিনী। মূলত তাদের স্বার্থেই পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ ও দলন চালিয়ে যায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বাঙালিদের রাজনৈতিক ও প্রাশাসনিক শাসন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে। এই বঞ্চনা ও শোষণ এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, যখন তার প্রতিষেধক হিসেবে ছয় দফা হয়ে গেল বাঙালির মহাসনদ তখন তারা এটি মেনে নিতে পারল না। তারা গণতন্ত্রকে বানচাল করার জন্য ২৫ মার্চের কালো রাতে শুরু করল তাদের মহাহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ অপারেশন সার্চলাইট। সেই অপারেশনটিকেই ব্যর্থ করে দিল সামরিকভাবে দুর্বল ও অপ্রস্তুত স্বাধীনচেতা সংগ্রামী বাঙালি জনগণ। নয় মাসের অত্যাচার–অবিচারের চূড়ান্ত ফায়সালা হল নভেম্বর-ডিসেম্বরের সম্মুখ সমরে। পাকিস্তানের 'সুশিক্ষত ও সুশৃঙ্খল' সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হয় তখন, যখন তারা পরিণত হয় একটি দুর্বত্ত দস্যু বাহিনীতে। তাদের ধ্বংস ও রাষ্ট্রের ভাঙন আসে তাদেরই কারণে যখন তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে ও তার বাস্তবায়নে নিজেরাই হয়ে যায় সর্বেসর্বা। অত্যন্ত কাকতালীয় বিষয় হল, সেই আধখানা পাকিস্তান আবার এক ক্ষমতালোলুপ সেনা শাসকের আমলেই আরো ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি।

যাই হোক, বিজয়ের মাসে হিসাব-নিকাশে লাগলে মনে হয় যে, খানিকটা আশার আলো যেন উঁকি দিচ্ছে। রাজাকার শাসিত দুঃসময়ের কিছু অপকীর্তি এখন সংশোধিত হচ্ছে। প্রথম আশার আলো দেখি যে, আবার আমরা মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল দিনের এবং দুঃখের কাহিনীর কথা মনে করছি ৭ মার্চ থেকে শুরু করে প্রতিদিন (শুধু শুক্রবার বাদে)। চ্যানেল আই টেলিভিশনের কল্যাণে আমরা দেখছি 'মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন' নামক একটি অনবদ্য প্রোগ্রাম। বিখ্যাত শিল্পী ও উপস্থাপক মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ বাচ্চু এবং সম্মানিত গবেষক ও লেখক মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আরেফিন এই প্রোগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের নানা কাহিনী, দলিল, চিত্র ইত্যাদি আমাদের প্রতিদিন উপহার দিচ্ছেন। এবং আগামী বছরের ২৬ মার্চ পর্যন্ত এই সুযোগটি অব্যাহত রাখবেন। দ্বিতীয় আশার আলো দেখছি অবশেষে পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতির বোধহয় অবসান হল। রাজাকারকে আবার রাজাকার বলা



www.pathagar.com

যাবে।জামায়াত-আলবদরের খুনিদের আবার সেভাবেই শনাক্ত করা যাবে। হানাদারদের আবার পাকিস্তানি বলে আখ্যায়িত করা যাবে। তৃতীয় আশার আলোটি দেখছি, জাতি আবার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দিকে নজর দিয়েছে এবং তাদের নির্বাচনের জন্য অনুপযুক্ত করতে চাইছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে কোন বাধা নেই, যদিও জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের যোগসাজশ আইন বাতিল করে দেন। ১৯৭৩ সালের যুদ্ধপরাধী আইন এখনও বলবৎ আছে। ১৯৭২–৭৪ সালে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশই পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হতে দেয় নি। কিন্তু বর্তমান পরিবেশ অন্যরকমের এবং অন্যান্য দেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীরা এবার ত্রাণ পাবে না, তারা বড় বেপরোয়া হয়ে গেছে তাই তাদের শাস্তি পেতেই হবে। তাদের কোন অনুশোচনা নেই বরং দম্ভ তাদের সীমাহীন। পুরনো তদন্তগুলোর দলিল-দস্তাবেজ এখন পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং বিচারের জন্য আদালত ও তদন্ত সংস্থা এখন নির্দিষ্ট করতে হবে।

তবে নিরাশা ও হতাশা এখনও তীব্র। সাম্প্রদায়িকতার বিষ এখনও সমাজে বিরাজ করছে। গণতন্ত্র তো নেই; অনির্বাচিত সরকারকে দায়িত্ব নিতে হয়েছে। অবশ্যই আমরা আশা করছি যে, এই সরকার অচিরেই নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে। নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ, স্থানীয় সরকারের নানা স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য অবাস্তব আইন প্রণয়ন ইত্যাদিতে সময় নষ্ট না করে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে মনোযোগ দিয়ে সরকারও নির্বাচন কমিশন আমাদের নিশ্চিন্ত করবে। বর্তমানে অর্থনীতির যে বিপর্যস্ত হাল, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে যে স্থবিরতা, আয় বৈষম্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থানে যে ধস দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় বর্তমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হল অর্থনীতির পুনর্জাগরণ ও পুনর্বিন্যাস।

আমি লেখাটি লিখছি ৪ ডিসেম্বর। আমাদের জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভবে এটি বড় গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিনই নিউইয়র্কে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনের হুকুমে তাদের রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশ সিনিয়র ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধের বিষয়টি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করেন। মার্কিন সরকার ভারতের যুদ্ধবাজ আক্রান্তকারী ঘোষণা করে, যদিও বিমান হামলাটি চালান জেনারেল ইয়াহিয়া আর ভারতের ইন্দিরা গান্ধী তখন ছিলেন কলকাতা ভ্রমণে। তারা কোন মতেই মানতে রাজি ছিলেন না যে, বাংলাদেশ নয় মাস ধরেই



www.pathagar.com

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। তাদের প্রস্তাব হল তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি এবং পাকিস্তান ও ভারতের সেনাবাহিনীর নিজস্ব দেশে প্রত্যাবর্তন। তাদের কৌশল ছিল অত্যন্ত অসৎ। সেহেতু বাংলাদেশের যুদ্ধ বা সেনাবাহিনীর কোন স্বীকৃতি ছিল না; তাই তাদের দখলিকৃত সমুদয় ভূখণ্ড পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়া ছিল এই অসৎ উদ্দেশ্য। সোভিয়েত রাশিয়ার ভেটোতে এই প্রস্তাব নাকচ হয়। কিন্তু অধ্যবসায়ী নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটি আরও দু'বার এই অসৎ প্রস্তাব পেশ করে প্রথমে ৬ ডিসেম্বরে এবং পরে ১৩ ডিসেম্বর। প্রত্যেকবারই সোভিয়েত ভেটোর প্রয়োজন হয়। এই ভেটো না হলে মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে পাকিস্তানি দখল পুনর্বহাল হতো আর বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব অন্তত সাময়িকতাভাব বিঘ্নিত হতো। হাজার শোকরিয়া যে, নানা আশা-নিরাশার দোলনায় চড়লেও অন্তত স্বাধীন দেশের নাগরিক তো আমি, জয় বাংলা।

*৪ ডিসেম্বর ২০০৭, যুগান্তর*



www.pathagar.com

# বিজয়ের মাস ও সামনের চ্যালেঞ্জ

বিজয়ের মাস বলতেই আমাদের অনুভূতিতে জেগে উঠে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের পরিণতির কথা। আমাদের মনের মুকুরে ভেসে বেড়ায় একাত্তরের মার্চ থেকে শুরু করে হত্যা, লুটপাট, ধ্বংস, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং নানাবিধ নির্যাতনের চিত্র। একই সঙ্গে আমাদের বুক ফুলে উঠে যখন মনে পড়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কেমন অসমসাহসী, গেরিলা তৎপরতায় দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। এবং আমরা আরো মনে করি কিভাবে ভারতের সহায়তায় আমাদের প্রতিরোধ ও সংঘর্ষ দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করে। আমরা অনুধাবন করি যে ডিসেম্বরে সরাসরি সম্মুখসমর শুরু হলেও অনেক আগে থেকেই আমরা দখলদারদের অনবরত তাড়িয়ে কোণঠাসা করে দিচ্ছিলাম। বস্তুতপক্ষে অক্টোবর থেকেই পাকিস্তানিরা গুহায় আশ্রয় নিতে শুরু করে। তারা শুধু ছাউনি অথবা সুসংগঠিত ক্যাম্প ছাড়া আর কোথাও থাকতো না এবং অন্তত কোম্পানি পরিসরে তাদের হত্যাযজ্ঞ বা লুটপাটে বেরুতো। নভেম্বরের একুশেতে ভারত যখন ভারী অস্ত্রের সহায়তা দিতে রাজি হলো তখন থেকেই কিন্তু সম্মুখসমরের সূচনা হয়। ৩ ডিসেম্বরে পাকিস্তান যখন পশ্চিম সীমান্তে বিমান হামলা পরিচালনা করলো তখনই শুরু হলো অঘোষিত পাক ভারত যুদ্ধ এবং কদিনের মধ্যেই ৬ ডিসেম্বরে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনী গঠন করলো। দুর্দমনীয় ভারত-বাংলাদেশ আক্রমণের মুখে পাকিস্তান বাহিনী টিকতেই পারলো না এবং ১৬ ডিসেম্বরে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে রক্ষা পেলো।

**দুই.**

আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করলে কিন্তু বিজয়ের মাসের অন্যরকম মূল্যায়ন করতে হয়। এইটি ছিল হাজার বছরের বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র গঠনের চূড়ান্ত পর্ব। বাংলা ভাষার আবির্ভাব হয় সপ্তম খ্রিস্টাব্দে। একই সময়ে এই



www.pathagar.com

ভাষাভাষী ভূখণ্ডের ছোট ছোট রাজ্য বা জনগোষ্ঠীর একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। অবশ্যি যুগের সঙ্গে তাল রেখে এই ভূখণ্ডের ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র পশ্চিমে এবং পূর্বেও বিস্তৃত হয়। রাজা শশাঙ্ক গৌড়-বরেন্দ্র-রাঢ়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ধাবিত হন। পালেরা গৌড়-বরেন্দ্র-রাঢ় সমতটকে ঐক্যবদ্ধ করে পূর্বে পশ্চিমে সর্বত্র বিচরণ করেন। সেনেরাও রাঢ়ে শুরু করে গৌড়, সমতট বরেন্দ্র ঐক্যবদ্ধ করে পূর্ব ও পশ্চিমে তাদের দখল বিস্তার করেন। বখতিয়ার খিলজী বাংলা বিজয় করেন আফগানিস্তানের ঘোরী রাজবংশের সেনাপতি হিসেবে। দিল্লিতে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পেলে বাংলাদেশ হয় দিল্লি রাজত্বের একটি রাজ্য (প্রদেশ বা সুবা)। মাঝে মাঝে অবশ্যি বাংলা বিহারের শাসনকর্তারা দিল্লির কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীন সুলতান বনে যান। তবে ১২০৩ সাল থেকে বখতিয়ার খিলজীর গৌড় দখল করার পর থেকে ১৩৪২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল কেন্দ্রীয় ঘোরী, দাস, খিলজী এবং তুঘলক রাজত্বের কর্তৃত্বাধীন রাজ্যবিশেষ। দিল্লির নিযুক্ত শাসনকর্তারা তখন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুগত অথচ প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালক ছিলেন। ১৩৪২ সালে হলো এ অবস্থায় পরিবর্তন। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ দিল্লির তুঘলকশাহী শাসনকর্তাদের পরাজিত ও বিতাড়ন করে লখনৌটি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও নামক তিনটি বিভাগকে একত্র করে নিজেকে ঘোষণা করলেন শাহ-এ-বাংগালা। এই হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সূচনা। পরবর্তী প্রায় আড়াইশ বছর বাংলায় রাজত্ব করেন ইলিয়াস শাহী, হাবশী, হোসেন শাহী, সুর এবং কররানি বংশের সুলতানবর্গ। প্রবল পরাক্রমশালী মোগল সম্রাট আকবর ১৫৭৬ সালে বাংলা দখল করেন তবে পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বছর বাংলার ছোট ছোট সামন্ত প্রভুরা মোগল আধিপত্য মেনে নেন নি। ১৬১২ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত মোগল সুবা বাংলার শাসনকর্তারাই বাংলাদেশে নবাব হিসেবে নিজেদের খেয়াল খুশিতে শাসন করেন। অতঃপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শত বছর (১৭৫৭-১৮৫৭) এবং ব্রিটিশ সম্রাটের নব্বই বছর (১৮৫৮-১৯৪৭) বাংলাদেশে চলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন। সর্বশেষ পর্বে ছিল পাকিস্তানের ২৩ বছরের অনাকাঙ্ক্ষিত ঔপনিবেশিক শাসন।



www.pathagar.com

**তিন.**

বাংলার ভৌগোলিক ঐক্যের বিকাশ কাহিনী প্রথমে বিঘ্নিত হয় ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ আমলে বংগভংগ ঘটলে। বংগভংগ রদ হয় ১৯১১ সালে কিন্তু ব্রিটিশ শাসন অবসানে ১৯৪৭ সালে বাংলা আবার বিভক্ত হয়– পূর্ব বাংলা ও পশ্চিমবংগ। পশ্চিমবংগ ভারতীয় ইউনিয়নে নিজের একটি অবস্থান ঠিক করে নেয়। পূর্ব বাংলা কিন্তু পাকিস্তান ফেডারেশনে সেই রকম কোনো অবস্থানে পৌঁছতে পারলো না। প্রধানত তিনটি কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বনাবনি হলো না। প্রথমত, পশ্চিমের সামরিক-বেসামরিক আমলা চক্রান্ত হলো প্রচণ্ড শক্তিশালী ও আঞ্চলিক স্বার্থে নিবেদিত। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের আদর্শহীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব শাসন-শোষণের উর্ধ্বে উঠতে পারলো না। তৃতীয়ত, সামরিক সরকারের অগণতান্ত্রিক, কায়েমি স্বার্থবাদী ও জংলি শাসনের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য কোনো পাকিস্তানি জাতিসত্তাকে বিকশিত হতে দিল না। এই ইতিহাস বলে যে বিজয়ের মাসের বিরাট অর্জন হলো বাংলাদেশে বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। এই জাতিরাষ্ট্র বস্তুতই বাঙালি জাতিরাষ্ট্র, বাংলাদেশী জাতিরাষ্ট্র নয়। বাংলাদেশের নাগরিক বাংলাদেশী হতে পারে কিন্তু জাতিরাষ্ট্রটি হলো বাঙালি সত্তার। একটি উদাহরণ নিয়ে তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা যায়। জার্মানি হলো জার্মান জাতিরাষ্ট্র কিন্তু জার্মানরা অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া নানা দেশের নাগরিক। ঠিক তেমনি বাঙালিরা আসাম, পশ্চিমবঙ্গ বিহার এমনি সব ভারতীয় রাজ্যের নাগরিক কিন্তু বাঙালির জাতিরাষ্ট্রটি হলো বাংলাদেশে।

**চার.**

বিজয়ের মাসে আরো দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করতে হয় আমাদের জাতিরাষ্ট্রের মজ্জা– মৌলিক মূল্যবোধ। হাজার বছরের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া বানিয়েছে এই মজ্জা- যার বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক সুযোগ পাওয়ার সমান অধিকার। এই ভূখণ্ডে আদিবাসী, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রিস্টান সব ধর্মাবলম্বীই রাজত্ব করেছে এবং সৃষ্টি করেছে একটি যৌগিক জাতি। এই চরিত্রটিকে দৃঢ়তর করে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ যখন পাকিস্তানের ধর্মান্ধ মুসলমানেরা বাঙালিদের ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, লিঙ্গ নির্বিশেষে নির্বিচারে হত্যা, ধ্বংস, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও নির্যাতন চালিয়ে যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে। পাকিস্তানি ধর্মান্ধদের অনুসারী জামাতে ইসলামের রাজাকার ও আলবদররা আজো চালিয়ে যাচ্ছে তাদের ধর্ম ব্যবসা ও ধর্মের নামে অত্যাচার-অনাচার।



www.pathagar.com

তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্ভবত কতিপয় দুর্বৃত্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দেশে মাথাচাড়া দিয়েছে হিংস্র জঙ্গিবাদ এবং মান্ধাতার আমলের রাষ্ট্র চিন্তা। এদের শক্তভাবে প্রতিরোধ ও মূল্যোৎপাটন, তাই সামনে এসেছে একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে। পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষিতে এখন আমাদের শক্তহাতে এসব প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে দমন করতে হবে। ৩৭ বছরের পুরোনো যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। তারা নিজেদের ক্ষমতার উপযুক্ত প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে। যে সব কেন্দ্রে ও প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের বিষ ছড়ানো হয় সেগুলোকে উচ্ছেদ করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় আনতে হবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন যাতে ধর্মান্ধতার চাষ বন্ধ করা যায় এবং অর্থবহ আধুনিক শিক্ষার আলো সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া যায়।

## পাঁচ.

আমাদের এই ভূখণ্ডে গণতন্ত্রের আদর্শ ও অনুশীলন কিন্তু বহুদিনের পুরোনো এবং জাতির বিপদকালে জনগণের গণতান্ত্রিক মানসিকতা তাকে উত্তরণের রাস্তা বাতলে দেয়। প্রাচীনকালে মাৎস্যান্যায়ের শতবর্ষের নৈরাজ্য নিয়ন্ত্রণে গণতন্ত্রের আদর্শ হয় মুশকিল আসান। সামন্ত প্রভু ও ছোট রাজন্যবর্গ সবাই মিলে রাজা গোপালকে ৭৫০ সালে নির্বাচিত করে রাষ্ট্রের কর্ণধার নিযুক্ত করে। পরবর্তী নৃপতিরা বা রাষ্ট্রউপরিচালকরা জনসমর্থন ছাড়া কখনো টিকে থাকতে পারেন নি। ইতিহাসের সবচেয়ে অত্যাচারী হাবসী বংশের সামরিক শাহী বিতাড়িত হয় মারাত্মক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে। ১৪৯২ সালে এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন অতি সাধারণ ও ধর্মপ্রাণ রাজকর্মচারী আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এবং এই বিপ্লবে বাংলার এক কোটি জনতার ১ লাখ ২০ হাজার জন নিহত। আধুনিক যুগে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধটিও হয়েছিল গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও দেশ শাসন থেকে বিরত করার উদ্যোগ নেয় ইয়াহিয়া-ভুট্টো সামরিক জান্তা। এই অন্যায় বোধের জন্য শহীদ হয় ৩০ লাখ বাঙালি। এবং বিজয়ের ফসল হিসেবে উপহার দেয় একটি চমৎকার গণতান্ত্রিক সংবিধান। ১৯৭২ সালের সংবিধানের বিশেষত্ব ছিল আইনের শাসন, ক্ষমতার প্রতিসংক্রম, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের নিশ্চয়তা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। অনেকে হয়তো জানেন না যে, সেই সংবিধানে নিবর্তনমূলক গ্রেপ্তার বা জরুরি অবস্থা ঘোষণার কোনো সুযোগই ছিল না। আমাদের স্থপতি পিতারা বাস্তবেই ছিলেন আদর্শবাদী, স্বাপ্নিক ও



www.pathagar.com

মানুষের মহত্বে বিশ্বাসী। আমাদের সমাজ বাস্তবেই গণতান্ত্রিক মানসিকতায় সমুজ্জ্বল। সমাজের এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উত্তরণ এই সমাজে অনেক সহজ। ক্ষমতা বা বিত্তের প্রদর্শনী সমাজ খুব বেশি সহ্য করে না। গণজাগরণে খুব সময় লাগে না যদিও সহনশক্তি ও নির্লিপ্ততা প্রায়শই সমাজ সংস্কারকদের হতাশ করে।

**ছয়.**

সামাজিক সুবিচার ও সমতা এক নয়। অসম সমাজেও অত্যধিক বঞ্চিতকে সচরাচর মেনে নেওয়া হয় না। সামাজিক সংহতি বর্তমানে বিঘ্নিত হয়ে গেলেও সামাজিক নিরাপত্তা একেবারেই খারিজ হয়ে যায় নি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রকটতর হলেও সামাজিক দায়িত্ব পুরোপুরি বিসর্জিত হয় নি। সমাজে ক্ষমতাশালীর শোষণ অবশ্যই রয়েছে। তবে সেই শোষণকে সীমিত করার উদ্যোগ একেবারে অনুপস্থিত নয়। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাভোগীরাই উপভোগ করতে চায় কিন্তু সেখানে বঞ্চিতদের কিছু ভাগ দেওয়ার জন্যও সামাজিক শক্তি একেবারে বসে নেই। অবশ্যি স্থানীয় সরকারের কাঠামো অনুপস্থিত বা দুর্বল থাকায় প্রশাসনিক অন্যায় ও অবিচারই দেশে আজ সর্বগ্রাসী এবং দুর্নীতি এতো ব্যাপক। বড়ো দুর্নীতি যথা যন্ত্রপাতি বা মালামাল সংগ্রহে কমিশন, পছন্দের লোককে প্রকল্প নির্মাণের কাজ প্রদান, অনুপযুক্ত আবেদনকারী প্রার্থীকে সুযোগদান– এসব নিম্ন পর্যায়ে জনগণের কষ্টের প্রধান কারণ নয়। সেখানে নিয়মিত দুর্নীতি যথা দলিল নিবন্ধনে উপরি খরচ, খাজনা দিতে গিয়ে ঘুষ প্রদান, কোনো রকম সেবা পেতে গোপনে বখশিশ দান, মামলার নালিশ দিতে বা বা তারিখ পেতে ঘি মালিশ ইত্যাদি হলো জনগণের দুঃখের উৎস। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু হলেই ঐসব বখশিশ, ঘুষ বা ফিস সব সময় বেড়ে যায়। তাতেই অর্থনৈতিক সুযোগ জনগণের জন্য সীমিত হয়ে যায়। শিক্ষার প্রসার বাস্তবেই অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করে কিন্তু শিক্ষার মান অবনমিত হলে সেই সুযোগেরও অবক্ষয় হয়। আর্থিক ঋণ পেলে রোজগারের সুযোগ বাড়ে এবং ক্ষুদ্র ঋণ আন্দোলন সেদিক দিয়ে সুযোগ সমতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ফসল চাষে সেই সুযোগ এখনো ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষী পাচ্ছে না। রাস্তাঘাট নির্মাণ, নদীনালার সংস্কার অর্থনৈতিক সুযোগ বাড়িয়েছে। যাতায়াত সহজ করেছে ও জাতীয় বাজারে প্রবেশ সুগম করেছে। বিদ্যুৎ বা জ্বালানি সরবরাহ অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখে। চাষীর বা শ্রমিকের



www.pathagar.com

কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে। এই ক্ষেত্রে ভ্রান্ত নীতি ও বড়ো মানের দুর্নীতি জ্বালানি সংকট সৃষ্টি করে জনগণের সুযোগকে দারুণভাবে সংকুচিত করেছে। ভূমি প্রশাসনে নৈরাজ্য ও অর্থনৈতিক সুযোগ সীমিত করে রেখেছে। প্রযুক্তির বিকাশ জমি মালিকানা ও জমি ব্যবহারের সনদ প্রদানকে অত্যন্ত সহজসাধ্য করেছে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা সর্বত্র প্রয়োগ করা যাচ্ছে না কতিপয় প্রতিষ্ঠানের গণবিরোধী ভূমিকার জন্য। উৎকোচের আড্ডাখানা ভূমি জরিপ দপ্তর ও ভূমি হস্তান্তর নিবন্ধন দপ্তর এবং দেওয়ানি আদালত হলো ভূমি প্রশাসনে সংস্কারের শত্রু। ভূমি সংস্কার এসব দপ্তরকে একেবারেই বিলুপ্ত করে দেবে। অর্থনৈতিক উন্নতি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে এখনো একেবারেই সোনার হরিণ। সামগ্রিকভাবে দরিদ্র দেশে বিনিয়োগ হয় সীমিত তাই অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি ততোটা ব্যাপক হতে পারে না। কিন্তু তবুও সীমিত সম্পদের দেশেও সামাজিক সুবিচারের সুযোগ কী করে হতে পারে তার কিছু নমুনা বা কৌশল আমরা বিবেচনা করলাম।

**সাত.**

বিজয়ের মাসে আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হলো বিজয়ের পেছনে যে চালিকাশক্তি ছিল, যে আদর্শ ও স্বপ্ন বিজয় লাভের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে আবার চাঙ্গা করতে হবে। বিষয়টিকে সার্থক করতে হবে। জয়বাংলা অতি মহৎ স্লোগান। এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের সিংহনিনাদ। এই স্লোগানের ও এই সিংহনিনাদের উপযুক্ত আমাদের হতে হবে। বিজয়ের মাসের অঙ্গীকার তাই বড়ো কঠোর এবং কঠিন।

*১৯ ডিসেম্বর ২০০৭, ভোরের কাগজ*



www.pathagar.com

# একুশে স্বাধীনতার প্রথম সোপান

একবিংশ শতাব্দীতে একুশে হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বিশ্বের প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ভাষার জন্য আশার একটি দিন। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে প্রায় অর্ধশত বছর কিন্তু একুশে ছিল বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের গৌরব চেতনা ও ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এই ভূখণ্ডের সাড়ে চার কোটি জনগণ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে, অন্যায়ের কাছে আমরা মাথা নত করি না আর মাতৃভাষার জন্য জীবন দিতে আমরা ভয় করি না। বাস্তবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি একুশেতেই স্থাপিত হয়।

বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের বীজ দীপ্ত হয় তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। প্রথম, সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাংক ভৌগোলিক ঐক্যের সূচনা করলেন। দ্বিতীয়, একই সময়ে বা তার কিছু পরে শুরু হল বাংলা ভাষার বিকাশ। তৃতীয়ত, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শুরু হল একটি যৌগিক জাতিগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ। ১৩৪২ সাল নাগাদ শামসুদ্দিন ইলিয়াস প্রথমে সাতগাঁও ও পরে পাণ্ডুয়াকে কেন্দ্র করে নিজেকে 'শাহে বাঙালিয়া' বলে প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৪৯৩ সালে গৌড়ের সৈয়দ হোসেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নামে ইলিয়াস শাহের বাংলায় বাস্তবেই একটি যৌগিক জাতি গড়ে তুললেন।

আধুনিক যুগে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে জাতিরাষ্ট্রের সূচনা হল বাহান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারি। বরকত, সালাম, রফিক, শফিক, জব্বার ও অহিউল্লা শহীদ হলেন ভাষার দাবিতে। ঢাকার রাজপথে আরও দশ-পনেরো জন নাম না জানা শহীদ জানালেন, জান দেব তবু ভাষা কেড়ে নিতে দেব না। সেদিন একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি আওয়াজ তুলল, অন্যায় আমরা মানি না আর আমাদের যুক্তিযুক্ত ও নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদে কোন বিধিনিষেধ আমরা চলতে দেব না।

বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের আনুগত্য ও অঙ্গীকার বহু যুগের। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে কবিগুরু আহূত এক



www.pathagar.com

সম্মেলনে যুবক গবেষণাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জানিয়ে দেন, ভারতবর্ষে জাতীয় ভাষার সঠিক দাবিদার হল বাংলা ভাষা। ১৯৩৭ সালের ২৩ এপ্রিলে বাংলার মুসলিম সমাজের প্রথম দৈনিক আজাদে 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে মওলানা আকরম খাঁ হিন্দি-উর্দুর বিতর্ক অবসানকল্পে এ দুটি ভাষারই দুর্বলতা আলোচনা করে জোরালো ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভারতের (তখন অখণ্ড ব্রিটিশ–ভারত) রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার সবচেয়ে যোগ্য দাবিদার হল সমৃদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক ভাষা আমাদের বাংলা ভাষা। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠালগ্নে জুন থেকে ডিসেম্বরব্যাপী দাবি ওঠে যে, বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তখন পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৬৩ শতাংশ ছিল পূর্ববাংলার বাংলা ভাষাভাষী জনগণ। আমার শহর সিলেটে আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা বিস্তর লেখালেখি ও সভা–সমিতি করি যারই পরিণামে ১৯৪৮ সালের ৮ মার্চ উর্দু সমর্থকারীরা আমাদের জনসভায় হামলা করে।

এদিকে ঢাকায় ডিসেম্বর থেকেই ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহল হয় সক্রিয়। ১১ মার্চে সেই সক্রিয়তা পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে পরিণত হয়। তবে ১৫ মার্চ এ বিষয়ে ছাত্রসমাজ ও পূর্ববাংলা সরকারের (খাজা নাজিমউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী) মধ্যে একটি আট দফা সমঝোতাও স্বাক্ষরিত হয়। মার্চের ২১ ও ২৪ তারিখে দুটো বক্তৃতায় পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা সফরে এসে বাংলার দাবি নাকচ করে শুধু উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার সুপারিশ করেন। গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ সাময়িকভাবে ভাষা আন্দোলনের গতিকে দুর্বল করেছিলেন তবে তাকে বানচাল করতে পারলেন না।

চার বছর পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খাজা নাজিমউদ্দিন তার স্বহস্তে সম্পাদিত চুক্তি ভুলে গিয়ে ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারিতে ঘোষণা দিলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত পূর্ববাংলা মানল না এবং তা পাল্টানোর জন্য শুরু হল শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ। শীতের মৌসুমে শিক্ষাঙ্গনে নিয়মিত কার্যক্রমের ব্যস্ততা কিন্তু বহাল রইল। ছাত্র সংসদের নির্বাচন ও অভিষেক চলল। খেলাধুলার সব প্রতিযোগিতা চলল। ছাত্র মহলে নাট্যভিনয় চলল। তারই মধ্যে প্রতিবাদে মুখর রইল শিক্ষাঙ্গন ও বিশ্ববিদ্যালয়। আমি তখন সিলেট থেকে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় আট মাসে নিজের বন্ধুমহল গড়ে তুলেছি। একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রতিবাদ হবে জোরালো। প্রাদেশিক পরিষদে



www.pathagar.com

আমাদের দাবি পৌঁছানো হবে। সহসা ২০ তারিখে সভা, শোভাযাত্রা, সমাবেশের ওপর এলো অনাকাঙ্ক্ষিত বিধিনিষেধ। লক্ষ্য করার বিষয় হল, আন্দোলনে দৃঢ় হলেও আমার শিক্ষাঙ্গনে আমাদের ছাত্র হিসেবে মূল কাজে কখনও অবহেলা করি নি।

আমাদের বন্ধু মহলে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, সকালে হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব। পকেটে টাকা-পয়সা থাকবে সীমিত। ১৪৪ ধারা ভেঙে আমরা পরিষদ ভবনের দিকে যাব। তবে বাধা আসতে পারে, ধরপাকড় হতে পারে। আমাদের মহলের বেশিরভাগ সদস্য ইতোমধ্যে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন যাদের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব সিদ্দিক, ক্রীড়াবিদ কাশেম, ইটিভিখ্যাত মাহমুদ, সিলেটের 'ছাত্রনেতা' কবীর গফরগাঁওয়ের মেসবাহ প্রমুখ। আমরা ক'জন এখনও পথ চলছি যেমন- সাবেক মন্ত্রী জাকারিয়া, পরিকল্পনা সদস্য নূরুল হক, সাবেক উপাচার্য আমিন, চার্টার্ড একাউনটেন্ট ফজলে, অর্থনীতিবিদ মোজাম্মেল, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসি প্রমুখ। আমরা সম্ভবত সকাল ১০টায়ই আমতলায় পৌঁছে গেলাম। মেডিকেল কলেজের বর্তমান ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড ছিল আমতলা, মধুর রেস্তোরা এবং একটি পুকুর অথবা ডোবা। সেখানে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের যে মেজাজ ও উত্তেজনা ছিল তাতে ১৪৪ ধারায় অন্যায় নিষেধাজ্ঞা মানার কোন সুযোগ ছিল না। আমতলার সভা শেষ হতে দুপুর। বিশ্ববিদ্যালয় গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামলেন দশজনের দল। শেলী ভাই তাদের সর্বাগ্রে। খানিক পরে মেয়েদের দল গেল। সাফিয়া খাতুন তাদের সর্বাগ্রে। তারপর আর শৃঙ্খলা নেই। রাস্তায় পুলিশের লাঠি আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে টিয়ার গ্যাস। ডোবার পচাজলে আমরা রুমাল ও কাপড় ভিজিয়ে টিয়ার গ্যাসের তীব্রতা হ্রাসের প্রয়াস নিতে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে ঝাঁক বেঁধে রাস্তায় নেমে মেডিকেল কলেজে কোনমতে ঢুকে পড়া। কেউ কেউ আবার প্রাচীর টপকিয়ে মেডিকেল কলেজে।

মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের এক কোণেই প্রাদেশিক পরিষদ ভবন। কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে রাস্তা পাড়ি দিলেই পরিষদ ভবন। হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছিল প্রচুর ইট (সেখানে নির্মাণকাজ চলছিল)। এই ইটই হল আমাদের একমাত্র অস্ত্র- ইটের ঢিল। আমরা দল বেঁধে গেট পেরিয়ে ইটবৃষ্টি চালাই। পুলিশ ছোঁড়ে কাঁদানে গ্যাসের কেনিস্টার আর তেড়ে আসে লাঠি হাতে। এই 'যুদ্ধ' চলল বোধহয় ঘন্টা দেড়েক বা দুই। সম্ভবত বেলা ২টার দিকে বসল মাইক্রোফোন। সেখানে অনেকে এসে ভাষার দাবির পক্ষে



www.pathagar.com

অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। দু'চারজন সংসদ সদস্যকেও বোধহয় রাস্তা রোধ করে মাইকে নিয়ে আসা হয়। ইতিমধ্যে আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই আহত হয়েছেন, সংজ্ঞা হারিয়েছেন। কাসেম, আশরাফ, সিদ্দিক এই দলে। কবির লাঠির আঘাতে রাস্তায় পড়ে সংজ্ঞাহীন। তাকে কোন মতে ধরাধরি করে কাঁটাতারের বেড়া ফাঁক করে উদ্ধার করলাম আমরা ক'জন। মেসবাহর বরাতে খবর আসে যে, কবির সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। বেলা ৩টার দিকে 'যুদ্ধের' বেগ কমে গেছে। মেডিকেল কলেজের রেস্তোরাঁয় আমরা ক'জন বসেছি। তখনই শোনা গেল গুলির আওয়াজ।

একুশের গৌরব, একুশের চেতনা, একুশের ঐক্য সবই বিকশিত হয় গুলিবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই। বায়ান্নর একুশের প্রতিবাদ এবং একুশের দ্রোহ উল্টো ঘোরে নি কখনও। বাইশেতে অনবরত এখানে সেখানে গুলিবর্ষণে মিছিল তো উল্টো ঘোরে নি। তেপ্পান্ন, চুয়ান্ন পঞ্চান্ন বছরে এই প্রতিবাদ, এই দ্রোহ অব্যাহত থেকেছে। এই দ্রোহ রূপ পেয়েছে চুয়ান্নর প্রাদেশিক নির্বাচনে। জোড়াতালি দিয়ে হলেও ঐক্য পরাস্ত করেছে গণবিরোধী সরকারকে। ভাষার লড়াই রূপান্তরিত হয়েছে স্বাধিকারের যুদ্ধে। ভাষার লড়াই বঞ্চনার বিরুদ্ধে ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। একুশের আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায় আমাদের স্বাধীনতার প্রথম সোপান। মুক্তিযুদ্ধের সুদৃঢ় ভিত্তি।

*৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, যুগান্তর*

www.pathagar.com